রাষ্ট্রীয় জীবনচরিতমালা

হরিনাথ দে

হরিনাথ দে

সুনীল বন্দ্যোপাধ্যায়

ন্যাশনাল বুক ট্রাস্ট, ইণ্ডিয়া, নয়াদিল্লি

সূচীপত্র

বহুভাষিতা ও ভাষাতত্ত্বের চর্চা

অদ্বিতীয় ভাষাবিদ ও পণ্ডিত হিসাবে পরিচিত ছিলেন হরিনাথ দে তাঁর চৌত্রিশ বছরের জীবৎকালে এবং এই স্বল্পায়ু জীবনে তিনি হয়ে ওঠেন এক কিংবদন্তির নায়ক। এশিয়া ও ইওরোপের বিভিন্ন ভাষা ও সাহিত্যে তাঁর অসাধারণ অধিকার ছিল। আরবী ও গ্রীকের মতন সুকঠিন ভাষার অভিধান ছিল তাঁর কণ্ঠস্থ। এবং তাঁর সামনে লাতিন নাটক থেকে একটি পঙ্‌ক্তি উদ্ধার করলে সাধারণত পরের পঙ্‌ক্তির জন্য তাঁর আর বই ওলটানোর দরকার হত না। কেননা সমগ্র লাতিন সাহিত্যই ছিল তাঁর স্মৃতিতে সজীব। দ্বিতীয়বার ইওরোপে থাকাকালে হরিনাথ একবার পোপ দশম পিয়ুস (Pius X)-এর দর্শন লাভ করেন। এই সাক্ষাৎকারের সময় একজন ভারতীয় যুবকের মুখে শুদ্ধ লাতিন ভাষায় সম্ভাষণ শুনে মহামান্য পোপ অত্যন্ত মুগ্ধ হন। তিনি তাঁকে ইতালির আধুনিক ভাষাচর্চার নির্দেশ দেন। হরিনাথ তখন তাঁর সঙ্গে ইতালীয় ভাষাতেই কথোপকথন শুরু করলেন। শুধুমাত্র ভাষা ও সাহিত্যচর্চাই নয়, মাতৃভাষা ছাড়া সংস্কৃত, লাতিন, গ্রীক, ইংরেজী ও ফরাসীতে ছন্দোবদ্ধ কবিতা রচনাতেও তিনি পারদর্শী ছিলেন। প্রাচীন ও আধুনিক বিভিন্ন ভাষার জটিল ছন্দের সাবলীল ব্যবহারে তিনি ছিলেন খুব দক্ষ। মুখে মুখেই তিনি এক ভাষার কবিতা অন্য ভাষায় ছন্দোবদ্ধ অনুবাদ করতে পারতেন।

বহুভাষা ও বহুবিদ্যায় হরিনাথের বিস্ময়কর জ্ঞান স্বভাবতই আমাদের জোভান্নি পিকো দেল্লা মিরান্দোলা (Giovanni Pico della Mirandola) এবং জেমস্ ক্রিথ্‌টন (James Crichton)-এর কথা স্মরণ করিয়ে দেয়। আঠার বছর বয়সে পিকো বাইশটি ভাষায় অধিকারের সুখ্যাতি অর্জন করেন। মাত্র একবার পড়েই তিনি স্বচ্ছন্দে যে কোনও গ্রন্থের নির্ভুল পুনরাবৃত্তি করতে পারতেন। ইতালীয় নবজাগরণের এই স্বনামধন্য সন্তান বলা বাহুল্য, একত্রিশ বছর বয়সে মারা যান। স্কট্‌ল্যান্ডের ক্রিথ্‌টন তো 'অতুলনীয়' আখ্যায় পরিচিত। বারটি ভাষায় অধিকার ছাড়া আরিস্তোতল (Aristotle)-এর সমগ্র রচনা তাঁর নখদর্পণে ছিল। এবং যে কোনও বিষয়ে মুহূর্তের মধ্যেই তিনি লাতিনে ছন্দোবদ্ধ কবিতারচনা করতে পারতেন। এই অমূল্য জীবনও পঁচিশ বছর বয়সে হঠাৎ শেষ হয়।

পৃথিবীর অনেক প্রাচীন ও আধুনিক ভাষায় হরিনাথের অসামান্য অধিকার ছিল। এবং এশিয়া ও ইওরোপের প্রখ্যাত পণ্ডিতেরা ছিলেন তাঁর ভাষাজ্ঞানে ও বিদ্যাবত্তায়

মুগ্ধ। লুপ্ত সংস্কৃত ভাষার লেখকদের কীর্তি উদ্ধারে হরিনাথের চেষ্টায় জাপানের খ্যাতনামা পণ্ডিত ওতানি কোজুই (Otani Kozui) খুব খুশী হন। এবং শ্রদ্ধা ও বন্ধুত্বের নিদর্শন হিসাবে তিনি তাঁকে চীনা ভাষায় লেখা বহু মূল্যবান গ্রন্থ উপহার দেন। রুশদেশের স্বনামধন্য পণ্ডিত ফেদোর ইপোলিতোভিচ্‌ শ্চের্বাৎস্কি (Fedor Ippolitovich Srcherbatsky) এদেশে এসে হরিনাথের সঙ্গে আলাপে অত্যন্ত আনন্দিত হন। দেশে ফিরে গিয়ে তিনি তাঁকে সেন্ট্‌ পিটার্সবুর্গ বিশ্ববিদ্যালয়ে এক মর্যাদাপূর্ণ পদগ্রহণের অনুরোধ জানান। বলা বাহুল্য, শুধুমাত্র রুশ ভাষায় হরিনাথের অধিকারই তাঁকে মুগ্ধ করেনি; বৌদ্ধ দর্শন ও ধর্মশাস্ত্রে তাঁর গভীর জ্ঞান এই সুবিখ্যাত পণ্ডিতের কাছে প্রমাণিত হয়। হরিনাথের বন্ধুত্বে ও পাণ্ডিত্যে মুগ্ধ হয়েই জার্মানীর প্রখ্যাত পণ্ডিত রিখার্ট ফন্‌ পিশেল্‌ (Richard von Pischel) কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের আমন্ত্রণ সাদরে গ্রহণ করেন। কিন্তু বার্লিন থেকে কলকাতায় আসার পথে কলেরারোগে মাদ্রাজে তাঁর মৃত্যু হয় (26 ডিসেম্বর 1908)।

বিভিন্ন বিষয়ে সুষ্ঠু অধ্যাপনা ছাড়া হরিনাথ কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাষা ও সাহিত্য বিষয়ক প্রায় সমস্ত পরীক্ষারই প্রশ্নকর্তা ও পরীক্ষক ছিলেন। ভাবতে অবাক লাগে যে ত্রিশ বছর বয়স পূর্ণ হওয়ার আগেই তিনি গ্রীক, লাতিন, প্রভঁসল, প্রাচীন ফরাসী, পর্তুগীজ, ইতালীয়, স্পেনীয়, ফরাসী, রুমানীয়, ডাচ্‌, ড্যানিশ, অ্যাংলো-স্যাকশন, গথিক, প্রাচীন ও মধ্যযুগীয় হাই জার্মান, সংস্কৃত, পালি, তিব্বতী, চীনা (ক্লাসিকল), তুর্কী, জেন্দ, হিব্রু (বিব্লিকল), আরবী, পারসীক উর্দু, হিন্দী, বাংলা, ওড়িয়া, মারাঠী, গুজরাতী প্রভৃতি ভাষায় পারদর্শিতা লাভ করেন। আর নূতন কোনও ভাষা শেখায় আগ্রহী হলে তিনি স্বচ্ছন্দে কয়েকবার পড়ে সেই ভাষার পুরো একখানি অভিধানকেই কণ্ঠস্থ করতে পারতেন।

হরিনাথ আজও আমাদের দেশে বহুভাষিতার প্রতীক হিসাবে প্রতিষ্ঠিত, ইওরোপে যেমন জুজেপ্পে কাস্‌পার্‌ মেৎসোফান্তি (Giuseppe Casppar Mezzofanti)। ভাষাচর্চার ক্ষেত্রে উভয়ের মধ্যে মিলও ছিল অনেক। শৈশবে মেৎসোফান্তি তাঁর পিতার অধীনে শিক্ষানবীশ ছিলেন। কিন্তু পিতার কারিগরী কাজে তাঁর আদৌ আগ্রহ ছিল না। ঘটনাক্রমে তাঁদের কারখানার পাশেই ছিল এক বিদ্যালয়। জনৈক বৃদ্ধ যাজক সেই বিদ্যালয়ে গ্রীক ও লাতিন ভাষা শেখাতেন। এবং শুধুমাত্র শুনেই মেৎসোফান্তির এই গ্রীক ও লাতিন শব্দাবলী কণ্ঠস্থ হয়ে যায়। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় এই যে তখনও তাঁর নিজের মাতৃভাষার অক্ষর পরিচয় হয়নি। পরবর্তীকালে চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যেই তাঁর নূতন এক ভাষা শেখার ইতিহাসও বিস্ময়কর। কর্মজীবনে মেৎসোফান্তি বোলোগ্‌না বিশ্ববিদ্যালয়ে গ্রীক, আরবী ও অন্যান্য ভাষার অধ্যাপনায় নিযুক্ত ছিলেন। 1833 খ্রীস্টাব্দে তিনি ভাটিকান্‌ লাইব্রেরির প্রধান গ্রন্থাগারিক

নিযুক্ত হন। পঞ্চাশ-ষাটটি বিভিন্ন ভাষায় তিনি প্রায় অবাধে কথা বলতে পারতেন। এবং এছাড়া আরও অনেক ভাষায় তাঁর অল্পাধিক অধিকার ছিল। অবশ্য আশ্চর্যের কথা এই যে ভাষাতত্ত্বে তিনি কোনো অবদানই রেখে যাননি, যেমন রেখে যেতে পারেননি পঁচিশটি ভাষায় পারদর্শী রাজা ষষ্ঠ মিথ্রাদাতেস্ (Mithradates VI)।

"ভারতের মেৎসোফান্তি" হরিনাথের প্রতিভা কিন্তু শুধুমাত্র ভাষাশেখায় সীমিত ছিল না। ভাষাতত্ত্বের চর্চায় তিনি ছিলেন আজীবন আগ্রহী। কেমব্রিজের কীর্তিমান অধ্যাপকেরা ভাষাতত্ত্বের চর্চায় হরিনাথের বিস্ময়কর নৈপুণ্যের কথা বারংবার উল্লেখ করেছেন। এদেশে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়েই প্রথম তুলনামূলক ভাষাতত্ত্বের প্রেমর্চাদ রায়চাঁদ ছাত্রবৃত্তি পরীক্ষা গ্রহণ করা হয় (1907)। আর সে সময় হরিনাথই প্রধান পরীক্ষক নির্বাচিত হন।

সংস্কৃত ভাষার সঙ্গে ইওরোপের ঘনিষ্ঠ পরিচয়ের ফলেই তুলনামূলক ভাষাতত্ত্ব নামে এই নূতন মানবিক বিজ্ঞানের উদ্ভব সম্ভব হয়। এই সংস্কৃতচর্চা ও তুলনামূলক ভাষা-তত্ত্বের জন্মকাহিনী এবং হরিনাথ সম্পর্কে এ বিষয়ক সংক্ষিপ্ত আলোচনা প্রাসঙ্গিক। ভারতে ইংরেজ শাসনের সূত্রেই সংস্কৃত চর্চার বিকাশ সম্ভব হয়েছিল। 1783 খ্রীস্টাব্দের 25 সেপ্টেম্বর ইংল্যান্ডের প্রখ্যাত পণ্ডিত উইলিয়ম্ জোন্স্ (William Jones) সুপ্রীম কোর্টের বিচারপতিরূপে কলকাতায় আসেন। আর অবিলম্বে লন্ডনের রয়াল সোসাইটির আদর্শে তিনি এই কলকাতা শহরে স্থাপন করলেন এশিয়াটিক সোসাইটি (14 জানুয়ারি 1874)। এই সোসাইটির প্রতিষ্ঠা প্রাচ্যবিদ্যাচর্চার ইতিহাসে এক বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়। পরবর্তীকালে এই সোসাইটির আদর্শেই আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রসহ ইওরোপের বিভিন্ন শহরে গড়ে উঠেছিল প্রাচ্যবিদ্যা সমিতি। ভারতবর্ষে আসার পূর্বে জোন্স্ যথার্থই বুঝেছিলেন যে প্রাচ্যবিদ্যার প্রসারে ইওরোপে এক সাংস্কৃতিক নবজাগরণ সম্ভব হবে। কলকাতার এশিয়াটিক সোসাইটির সভাপতি হিসাবে তিনি দশটি বার্ষিক ভাষণ দিয়েছিলেন। এই ভাষণগুলিতে তিনি এশিয়ার বিভিন্ন দেশের সভ্যতা ও সাংস্কৃতিক ইতিহাসের আলোচনা করেন। 1786 খ্রীস্টাব্দের 2 ফেব্রুয়ারি জোন্স্ যে ভাষণটি দেন তুলনামূলক ভাষাতত্ত্বের চর্চার ক্ষেত্রে সেটি খুব গুরুত্বপূর্ণ। তাঁর এই ভাষণের বিষয় ছিল হিন্দুজাতির ইতিহাস ও সংস্কৃতি। এই আলোচনার সূত্রে তিনি গ্রীক ও লাতিনের তুলনায় সংস্কৃত ভাষার ঐশ্বর্যের ভূয়সী প্রশংসা করেন। শুধু তাই নয়, তিনি সংস্কৃত, গ্রীক, লাতিন, গথিক, কেল্টিক ও প্রাচীন পারসীক ভাষাকে সমগোত্রজ হিসাবে চিহ্নিত করলেন। প্রসঙ্গক্রমে বলা যায় যে প্রাচ্যবিদ্যা ও ভাষাতত্ত্বে জোনসের অবদান সম্পর্কে হরিনাথ সচেতন ছিলেন। ইংল্যান্ডের রয়াল এশিয়াটিক সোসাইটি এবং জার্মান প্রাচ্যবিদ্যা সমিতির তিনি সদস্য মনোনীত হন। সর্বোপরি কলকাতার এশিয়াটিক সোসাইটির সদস্যপদ ছাড়া বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ কমিটিতে হরিনাথ যুক্ত ছিলেন

জোন্সের উল্লিখিত ঐতিহাসিক ভাষণে প্রথম অনুপ্রাণিত হন জার্মানজাতি। এই প্রেরণার সূত্রটিও খুব কৌতূহলজনক। 1789 খ্রীস্টাব্দে জোন্স্ সংস্কৃত ভাষা থেকে কালিদাসের 'অভিজ্ঞান-শকুন্তলম্' নাটকটি ইংরেজীতে অনুবাদ করেন। আর 1791 খ্রীস্টাব্দে জার্মান পর্যটক গেঅর্গ ফর্স্ট্যার (Georg Forstèr) হঠাৎ এই ইংরেজী অনুবাদের এক তরজমা প্রকাশ করলেন নিজের মাতৃভাষায়। এই জার্মান অনুবাদ পড়ে তাঁর দেশের সাহিত্যিক ও পণ্ডিতেরা সকলে মুগ্ধ হলেন। আর এই আগ্রহ ও অনুরাগের ফলেই জার্মান পণ্ডিতেরা সংস্কৃতচর্চায় মনোনিবেশ করেন। উনিশ শতকের শুরুতে ফ্রীডরিশ ফন্ শ্লেগেল্ (Friedrich von Schlegel সংস্কৃত শিক্ষার জন্য প্যারিসে যান। কেননা ইওরোপে তখন সংস্কৃতের ভাল শিক্ষক পাওয়া যেমন ছিল দুষ্কর, তেমনি মূল সংস্কৃত রচনাও সর্বত্র মিলত না। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে ফ্রান্সের জাতীয় গ্রন্থাগারে সেই সময় অনেক সংস্কৃত পুঁথি রক্ষিত ছিল। সৌভাগ্যক্রমে প্যারিসে গিয়ে শ্লেগেল্ হঠাৎ দেখা পেলেন এক সংস্কৃতজ্ঞের। এই সংস্কৃতজ্ঞের নাম আলেগজাণ্ডার হ্যামিন্টন (Alexander Hamilton)। স্কট্ল্যান্ডের এই পণ্ডিত ভারতীয় সামরিক বিভাগের পদস্থ কর্মচারী ছিলেন। কলকাতায় থাকাকালে (1790) তিনি সংস্কৃত ভাষাশেখায় অত্যন্ত আগ্রহী হন এবং চাকরিতে ইস্তফা দেন। তারপর এডিন্‌বরায় কয়েক বছর বসবাসের পর হ্যামিন্টন সাহেব সংস্কৃতচর্চার জন্যই ঘটনাক্রমে প্যারিসে যান (1803)। আর এই সুযোগে তাঁর কাছে বছর দুই শ্লেগেল্ সংস্কৃত ভাষা শেখেন। 1808 খ্রীস্টাব্দে প্রকাশিত হয় 'ভারতীয় ভাষা ও জ্ঞান বিষয়ক' শ্লেগেলের বিখ্যাত গ্রন্থ। এই গ্রন্থটি জার্মান ভাষায় লেখা। সংস্কৃত সাহিত্যের আংশিক অনুবাদ ছাড়া এই গ্রন্থ তুলনামূলক ভাষাতত্ত্ব বিষয়ে যথেষ্ট আলোকপাত করেছিল। 1816 খ্রীস্টাব্দে ফ্রানটস্ বোপ্ (Franz Bopp) 'গ্রীক, লাতিন, পারসীক ও জার্মান ভাষার তুলনামূলক বিচারে সংস্কৃত 'ধাতুরূপ বিষয়ক' এক গ্রন্থ প্রকাশ করলেন। এই যুগান্তকারী গ্রন্থটিও জার্মান ভাষায় লেখা। সংস্কৃত ভাষার সঙ্গে এই যে পরিচয় ইওরোপীয় পণ্ডিতদের ঘটল তার প্রকাশ আজও প্রায় সমানে বর্তমান। বলা বাহুল্য, এই ভাষাচর্চার সুদীর্ঘ ধারার সঙ্গে হরিনাথ বিশেষভাবে পরিচিত ছিলেন। সর্বোপরি সত্যব্রত সামশ্রমী, সতীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণ, হরপ্রসাদ শাস্ত্রী, ধর্মানন্দ কোসম্বী, আব্‌দুল্লাহ অল্-মামূন্-সুহ্‌রাবর্দি, গেঅর্গ তিবো (Georg Thibaut), এরন্স্ট টেওডোর ব্লখ্ (Ernst Theodor Bloch) প্রমুখ দেশীবিদেশী পণ্ডিতের ঘনিষ্ট বন্ধুত্ব তাঁকে প্রাচ্যবিদ্যার আলোচনায় অনুপ্রাণিত করেছিল। সংস্কৃত, পালি, পারসীক, আরবী, চীনা, তিব্বতী প্রভৃতি বিভিন্ন ভাষা থেকে প্রাচীন কীর্তির অনুবাদ ও সম্পাদনার কাজে হরিনাথ আজীবন যুক্ত ছিলেন। ভারতীয় তথা এশীয় সংস্কৃতির মূল্যবান সব সম্পদকে তিনি বিশ্ববাসীর সামনে সঠিক উপস্থাপনের গুরুত্বপূর্ণ কাজে নিজেকে

নিয়োজিত করেন। প্রাচ্যের বিভিন্ন ভাষার ব্যাকরণ ও অভিধান প্রণয়নের কাজেও তিনি মনোনিবেশ করেছিলেন।

প্রাচ্যবিদ্যায় হরিনাথের এই আগ্রহ আপাতদৃষ্টিতে খুবই বিস্ময়ের বিষয়। কেননা ইতিপূর্বে তিনি ইওরোপীয় ভাষা ও সাহিত্যের চর্চায় অসাধারণ অধিকার অর্জন করেন। আর এই বিস্ময়কর ঘটনা শুধুমাত্র তাঁর বহুমুখী প্রতিভার নিদর্শনই নয়। স্বদেশের সংস্কৃতি চর্চায় নিজেকে সম্পূর্ণভাবে নিয়োজিত করার আগে হরিনাথ চর্চা করেছিলেন ইওরোপীয সাহিত্য ও সংস্কৃতির। অবশ্য এই দুই সংস্কৃতির চর্চায় তাঁর আগ্রহ ছাত্রজীবনেই দেখা যায়। কেমব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র হিসাবে তিনি পাশ্চাত্যের ভাষা ও সাহিত্য অধ্যয়ন করেন। কিন্তু এই একই সময় তিনি আবার সংস্কৃত, পারসীক, আরবী প্রভৃতি প্রাচ্যের বিভিন্ন ভাষায় দক্ষতা অর্জন করেছিলেন। তার এই আগ্রহ আদৌ আকস্মিক নয়। প্রাচ্যবিদ্যা সম্পর্কে ইওরোপে যে বিস্ময়কর আগ্রহ ও উৎসাহ দেখা গিয়েছিল হরিনাথ তাতে যথার্থই অনুপ্রাণিত হন। তাই স্বদেশে ফেরার পর তাঁর গবেষণার বিষয়ও তিনি স্বভাবতই নির্বাচন করেন—প্রাচ্যবিদ্যা ও ভাষাতত্ত্ব। এই বিষয় নির্বাচনের মধ্যে তাঁর গভীর স্বদেশপ্রেম নিহিত ছিল।

ভারতবর্ষে ইংরেজ জাতির মনোভাব ছিল মূলত সাম্রাজ্যবাদী। শাসন ও বিচার বিভাগের কাজকর্ম সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার জন্য স্বভাবতই তারা এদেশে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য বিদ্যাচর্চার প্রতিষ্ঠান গড়ে তুলেছিল। এই প্রেরণাতেই প্রকৃতপক্ষে আমাদের শিক্ষা-সংস্কৃতির অগ্রগতির সূচনা। উইলিয়ম জোন্‌সের এদেশে আসার আগেই ভারতের প্রথম বড়লাট ওয়ারেন হেস্টিংস (Warren Hastings) প্রাচ্য-বিদ্যায় আগ্রহী হন। এবং এ বিষয়ে উৎসুক পণ্ডিতদের তিনি উৎসাহিত করেন। হেস্টিংসের উৎসাহ ও আগ্রহেই আরবী ও পারসীক বিদ্যাচর্চার জন্য 1781 খ্রীস্টাব্দে কলকাতা মাদ্রাসা স্থাপিত হয়। 1791 খ্রীস্টাব্দে স্বনামখ্যাত জোনাথান ডানকান (Jonathan Duncan)-এর চেষ্টায় সংস্কৃতচর্চার জন্য বারাণসীতে এক কলেজ প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। এই ধারাতেই কলকাতায় ফোর্ট উইলিয়ম কলেজ (1800) ও সংস্কৃত কলেজ (1824) স্থাপিত হয়। 1835 খ্রীস্টাব্দে টমাস ব্যাবিংটন মেকলে (Thomas Babington Macaulay)-র পরামর্শে ভারতের বড়লাট উইলিয়ম বেণ্টিংক্‌ (William Bentinck) সমগ্র দেশে ইংরেজী ভাষার মাধ্যমে উচ্চশিক্ষার প্রবর্তন করেন। এবং এই সিদ্ধান্তের পরিণতি হিসাবে 1857 খ্রীস্টাব্দে যথাক্রমে কলকাতা, বোম্বাই ও মাদ্রাজে বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয়। বলা বাহুল্য, ভারতের বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষার্থীদের পাশ্চাত্য শিক্ষার সঙ্গে প্রাচ্যবিদ্যার চর্চারও সুযোগদান করেছিল। প্রাচ্যবিদ্যার প্রসারে উল্লিখিত সরকারী উদ্যোগ ছাড়া শহর কলকাতাতেও উনিশ শতকের প্রথমার্ধে বহু টোল-চতুষ্পাঠী সক্রিয় ছিল। আর

ব্যক্তিগত চেষ্টার সার্থক নিদর্শন হিসাবে শোভাবাজারের সুবিখ্যাত রাধাকান্ত দেবের 'শব্দকল্পদ্রুম' (1817) নামে প্রকাণ্ড সংস্কৃত অভিধান প্রণয়নের কথাও স্মরণীয়। পূর্বেই বলা হয়েছে যে যুগপৎ এই প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যবিদ্যার অনুশীলনেই আমাদের নবজাগরণের সূচনা ও অগ্রগতি সম্ভব হয়। প্রসঙ্গক্রমে উল্লেখ্য যে বিদ্যাচর্চার এই উভয় ধারার সঙ্গেই হরিনাথের ঘনিষ্ঠ যোগ ছিল।

তদুপরি পূর্বসূরিদের মূল্যবান রচনা সম্পর্কে হরিনাথের অপরিসীম শ্রদ্ধা ছিল। পাণিনির কাল সম্বন্ধে মন্তব্য করতে গিয়ে তিনি সশ্রদ্ধচিত্তে রামকৃষ্ণ গোপাল ভণ্ডারকরের লেখার উল্লেখ করেছেন। 1877 খ্রীস্টাব্দে ভণ্ডারকর বোম্বাই বিশ্ববিদ্যালয়ে ভারতীয় ভাষাতত্ত্ব বিষয়ে এক মূল্যবান ভাষণ দেন। আর আশ্চর্যের বিষয় হল, এই বছরেই হরিনাথের জন্ম। ভারতের ভাষাবলীর কুলপঞ্জী পরবর্তীকালে জর্জ অ্যাব্রাহাম গ্রিয়ার্সন-(George Abraham Grierson)-এর গবেষণায় সুস্পষ্ট হয়। জন অ্যালেগজ্যাণ্ডার চ্যাপ্‌ম্যান (John Alexander Chapman)-এর বিবেচনায় হরিনাথ ছিলেন গ্রিয়ার্সনের মত মেধাসম্পন্ন ভাষাবিদ্‌। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে নব্য ভারতীয় আর্য ভাষা-সমূহের গোত্র নির্ধারণে হরিনাথ খুব আগ্রহী হন। এ বিষয়ে গবেষণার জন্য তিনি আরবী, পারসীক, সংস্কৃত, পালি ও মধ্যযুগীয় সংস্কৃত উপভাষাগুলির যথাযথ অধ্যয়ন করেন। ভাবতে আরও অবাক লাগে যে চীনা ও তিব্বতীয় সূত্র থেকে প্রাচীন ভারতীয় সাহিত্য ও ইতিহাসের পুনর্বিন্যাসের পরিকল্পনাও তাঁর ছিল। হরিনাথের ভাষাতাত্ত্বিক জ্ঞানের ভূয়সী প্রশংসা করেছেন জাপানের প্রখ্যাত পণ্ডিত ইয়ামাকামি সোগেন (Yamakami Sogen)। চীনা ও তিব্বতী অনুবাদ ছাড়া মূল সংস্কৃতে লেখা প্রাচীন বৌদ্ধগ্রন্থের হদিস আজ আর মেলে না। আমাদের সাংস্কৃতিক ইতিহাসের মূল্যায়নে এইসব অমূল্য গ্রন্থের পুনরুদ্ধার একান্ত প্রয়োজনীয়। ইয়ামা-কামির মতে, ভারতীয় পণ্ডিতদের কাছে যে কাজটি ছিল সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ সেই কাজেই হরিনাথ ব্যাপৃত ছিলেন। ভারতের নবজাগরণের মহান সন্তান মধুসূদন দত্তের সঙ্গে এক্ষেত্রে তাঁর তুলনা করা যায়। মাতৃভাষার ঐশ্বর্য বৃদ্ধির জন্য মধুসূদন এক সময় স্কুলের ছাত্রের মতই নিয়মিত দেশীবিদেশী বিভিন্ন ভাষার অধ্যয়নে আগ্রহী হন। হরিনাথও তেমনি এশিয়া ও ইউরোপের বহুভাষার চর্চা করেন ভারতীয় তথা এশীয় ভাষা, সাহিত্য ও সংস্কৃতির প্রসার ও শ্রীবৃদ্ধির আকাঙ্ক্ষায়।

প্রতিভার উন্মেষ

1877 খ্রীস্টাব্দের 12 আগস্ট কলকাতার কাছেই চব্বিশ পরগনা জেলার আড়িয়াদহ গ্রামে হরিনাথের জন্ম। আড়িয়াদহ তাঁর মামাবাড়ি। হরিনাথের মা এলোকেশী দেবী ছিলেন আড়িয়াদহের উমাচরণ মিত্রের ছোট মেয়ে। তাঁর বাবা রায় ভূতনাথ দে বাহাদুরের বাল্যকাল মোটেই সুখের ছিল না। কেননা অতি অল্প বয়সে ভূতনাথ তাঁর পিতামাতাকে হারান। চব্বিশ পরগনার বহড়ু গ্রামের দ্বারকানাথ ভঞ্জের আশ্রয়েই তাঁর কৈশোর ও যৌবনের অনেকখানি অতিবাহিত হয়। কলকাতার প্রেসিডেন্সি কলেজের ছাত্র হিসাবে তিনি বিশ্ববিদ্যালয়ের এম্. এ. (1874) ও বি. এল্. (1876) পাস করেন। প্রসঙ্গত বলা যায় যে ছাত্রাবস্থায় এবং আইনজীবী হিসাবে কর্মজীবন শুরু করার কয়েক বছর পর্যন্ত ভূতনাথের পদবী বা বংশ নাম 'দেব' হিসাবেই সর্বত্র দেখা যায়। 1880 খ্রীস্টাব্দ থেকে তাঁর পদবী 'দে' হিসাবে ব্যবহৃত হয়েছে। দ্বারকানাথের বাড়িতে থাকাকালেই ভূতনাথের বিবাহ হয়। বিবাহের অল্পকাল পরে তাঁর শ্বশুর মহাশয়ের পরামর্শে তিনি মধ্যপ্রদেশের রায়পুরে যান। পরবর্তীকালে রায়পুরে বিখ্যাত আইন ব্যবসায়ী হিসাবে তিনি যথেষ্ট যশ ও অর্থোপার্জন করেন। অবশ্য তাঁর এই অর্জিত অর্থের অনেকটাই তিনি ব্যয় করতেন বহুবিধ লোকহিতকর কার্যে। সুবিখ্যাত বাংলা অভিধান-প্রণেতা জ্ঞানেন্দ্রমোহন দাস তাঁর 'বঙ্গের বাহিরে বাঙালী' (1931) গ্রন্থে লিখেছেন: "স্বনামখ্যাত অদ্বিতীয় ভাষাবিৎ পরলোকগত হরিনাথ দে মহাশয়ের পিতা স্বর্গীয় রায় ভূতনাথ দে, এম. এ., বি. এল. বাহাদুর রায়-পুরের প্রধান উকীল ছিলেন। তিনি এখানকার বর্তমান সকল উন্নতির প্রবর্তক। তিনি রায়পুর আদালতের উকীল সম্প্রদায়ের নেতা, স্থানীয় মিউনিসিপ্যালিটির ভাইস-চেয়ারম্যান এবং শিক্ষার উৎসাহদাতা ছিলেন। তাঁহারই ঐকান্তিক চেষ্টায় ও তোদরগড়-রাজের অর্থসাহায্যে এখানে পানীয় জলের কল প্রতিষ্ঠিত হয় এবং জনহিতকর কার্যের পুরস্কারস্বরূপ তিনি ভারত গভর্নমেণ্ট কর্তৃক রায় বাহাদুর উপাধিতে ভূষিত হন। তাঁহার বদান্যতা, আতিথেয়তা, সত্যনিষ্ঠা, উদ্যমশীলতা এবং জনহিতৈষণার জন্য সমগ্র মধ্যপ্রদেশে তাঁহার সুনাম বিস্তার লাভ করে।"

হরিনাথের বয়স বছরখানেক হলে তাঁর মা ছেলেকে নিয়ে রায়পুরে যান। তখনকার দিনে দেশের সর্বত্র রেলগাড়ির চলাচল ছিল না। কলকাতা থেকে জব্বলপুর পর্যন্ত তখন রেলগাড়িতে যাওয়া যেত। তারপর প্রায় একশ ষাট মাইল পথের অধিকাংশই

গরুর গাড়িতে অতিক্রম করতে হত। পথ-ঘাটেরও অবস্থা তখন খুব উন্নত ছিল না। সেক্ষেত্রে ছইওয়ালা গরুর গাড়িতে দূরদেশে পাড়ি দেওয়া যে কি বিপদের ছিল তা সহজেই অনুমান করা যায়। শিশু হরিনাথকে নিয়ে তাঁর মায়ের এই যাত্রায় স্বামী বিবেকানন্দের (তখন নরেন্দ্রনাথ দত্ত) মাতাও অন্যতম সহযাত্রিণী ছিলেন। কেননা বিবেকানন্দের পিতা বিশ্বনাথ দত্তকে এই সময় কার্যোপলক্ষে কিছুকাল রায়পুরে থাকতে হয়েছিল।

হরিনাথের শৈশব ও কৈশোর রায়পুরেই কাটে। বছর পাঁচেক বয়সে তিনি এক ভীষণ অসুখে আক্রান্ত হন। এই ব্যাধিতে তাঁর বাঁচার আশা আদৌ ছিল না। সৌভাগ্যক্রমে শেষ পর্যন্ত তিনি এই ভয়ানক রোগের হাত থেকে রক্ষা পান।

মায়ের কাছেই হরিনাথের হাতেখড়ি। বিদ্যানুরাগী উমাচরণ মিত্র তাঁর কন্যাদের জন্য উমেশচন্দ্র দত্ত সম্পাদিত 'বামাবোধিনী পত্রিকা'-র গ্রাহক হন। এই মাসিক পত্রিকাপাঠে এলোকেশী দেবীর বাংলা ভাষার সঙ্গে পরিচয় ঘনিষ্ঠ হয়। পরবর্তীকালে হিন্দী ও মারাঠী ছাড়া ইংরেজী ভাষাও তিনি শেখেন। ব্যাঙ্কের চিঠিপত্র ইত্যাদি তিনি নিজেই লিখতেন। হরিনাথের বিস্ময়কর ভাষাজ্ঞানের পরিপ্রেক্ষিতে তাঁর মায়ের এই ভাষাগত নৈপুণ্য তাৎপর্যপূর্ণ। সংসারের দৈনন্দিন কাজকর্মের অবসরে মা একদিন ছেলেকে বাংলা বর্ণমালা চিনিয়ে দিলেন। আর ছেলে সহজেই অক্ষরগুলি শিখে নিয়ে তরকারির খোসা ও কাঠকয়লা দিয়ে সারা বাড়ির মেঝে এমনকি দেওয়ালে অক্ষরগুলি লিখতে শুরু করলেন। এইভাবে একদিনেই বাংলা বর্ণমালা চিনে লেখা এবং শেখাও হয়ে গেল তাঁর।

রায়পুরের মিশন স্কুলে হরিনাথের বাল্যশিক্ষার সূচনা। কিছুকাল এখানে পড়াশুনার পর তিনি নরম্যাল স্কুলে ভর্তি হন। 1887 খ্রীস্টাব্দে তিনি এই স্কুল থেকে আপার প্রাইমারি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে ভর্তি হলেন এখানকার সরকারী উচ্চবিদ্যালয়ে। প্রাথমিক বিদ্যালয়ে হরিনাথ অবশ্য তাঁর প্রতিভার প্রায় কোনো পরিচয়ই দেখাতে পারেননি। অঙ্কশাস্ত্রে তিনি বরাবরই বেশ একটু কাঁচা ছিলেন। ক্লাসে কোনো অঙ্কই ঠিকমত কষতে না পারার জন্য প্রায়ই তাঁকে অপমানকর শাস্তি ভোগ করতে হত। ফলে এইসব শাস্তির হাত থেকে রেহাই পাওয়ার জন্য বিদ্যালয়ে গরহাজির এবং 'কোম্পানীর বাগিচা'-য় বসে থাকা ছিল তাঁর নিত্যকার ঘটনা। মায়ের অতিরিক্ত শাসনেই হোক বা বাবার অত্যন্ত প্রশ্রয়েই হোক, প্রকৃতপক্ষে প্রাথমিক শিক্ষাজীবনে হরিনাথ ছাত্রহিসাবে যথেষ্ট কৃতিত্ব দেখাতে পারেননি। প্রথম জীবনের এই ব্যর্থতার শোধ অবশ্য তিনি তুলেছিলেন পরবর্তীকালে প্রায় সারা জীবনব্যাপী প্রত্যেকটি পরীক্ষাতে।

একটি ঘটনা। ক্লাসের সেরা ছেলে নাটু ছিল হরিনাথের অন্তরঙ্গ বন্ধু। হরিনাথ একদিন নাটুকে ডাকতে তাদের বাড়িতে গেলে নাটুর বাবা ডাক্তার উমেশচন্দ্র মিত্রের

কাছে অত্যন্ত তিরস্কৃত হন। বন্ধুর বাবার ব্যবহারে তিনি এতই ক্ষুব্ধ হলেন যে তৎক্ষণাৎ বাড়ি ফিরে বাবাকে সব কথা বলেন। তারপর পিতাপুত্রে, বলা চলে, এক চুক্তি হয়। চুক্তিতে ঠিক হল, হরিনাথ মনোযোগ দিয়ে লেখাপড়া করবেন আর ভূতনাথও ছেলের পছন্দমত যে-কোনো সময় যে-কোনো বই কিনে দেবেন। শুধু মুখের কথাই নয়, কাজেও পরিণত করলেন পুত্রবৎসল ভূতনাথ। ছেলেকে নিয়ে তিনি সরাসরি স্থানীয় পুস্তক-বিক্রেতা 'পারসীর দোকানে' গেলেন এবং ছেলের কাছে নিজের প্রতিশ্রুতি রক্ষা করলেন। হরিনাথের শিক্ষাজীবনে এই সামান্য ঘটনাটি দেখা দিল অসামান্যরূপে। অঙ্কশাস্ত্রে কাঁচা হওয়া সত্ত্বেও তাঁর নাম দেখা যেত সবার উপরে। 1890 খ্রীস্টাব্দে মিড্‌ল্ স্কুল পরীক্ষায় তিনি প্রথম বিভাগে পাস করে স্কলারশিপ্ লাভ করেন।

কৈশোরে হরিনাথ তাঁদের বাড়ির নিকটবর্তী এক মিশনারী প্রতিষ্ঠানের সংস্পর্শে আসেন। এবং তাঁদের প্রেরণায় বাল্যাবস্থায় বাইবেলের ইংরাজী অনুবাদ থেকে তিনি এক হিন্দী ভাষান্তর শুরু করেন। এমন কি এই সময় মিশনারীদের উৎসাহ ও সহায়তায় তিনি লাতিন ভাষা শিখতে শুরু করেন। পরবর্তীকালে লাতিন ভাষায় তাঁর অসাধারণ দক্ষতার কথা বলাই বাহুল্য।

শিক্ষায় সাফল্য

মিড্‌ল্‌ স্কুল পরীক্ষায় পাস করার পর হরিনাথ এলেন কলকাতায়। রিপন স্ট্রীটের জনৈক ম্যাগ্রা (McGrath) সাহেবের তত্ত্বাবধানে কিছুকাল কাটানোর পর 1891 খ্রীস্টাব্দের 1 মে তিনি সেন্ট্‌ জেভিয়ার্স কলেজের স্কুল বিভাগের এন্‌ট্রন্‌স্‌ ক্লাসে ভর্তি হলেন। এই সময় তিনি ওই কলেজের ছাত্রাবাসে থাকতেন। 1892 খ্রীস্টাব্দে এই কলেজ থেকে তিনি প্রথম বিভাগে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের এনট্রন্‌স্‌ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। এই পরীক্ষার কয়েক মাস আগে এক দুর্ঘটনায় তাঁর ডান চোখে আঘাত লাগে এবং তাঁকে কলকাতায় মেডিকল কলেজে ভর্তি করা হয়। স্বভাবতই এই সময় তাঁর পড়াশুনা বন্ধ থাকে। মাঝে মাঝে পাঠ্যপুস্তক থেকে কিছু অংশ তাঁকে পড়ে শোনান হত মাত্র। ফলে এই পরীক্ষায় তাঁর ফল আশানুরূপ হয়নি। তবে এই পরীক্ষায় তিনি একটি স্কলারশিপ পেয়েছিলেন।

এন্‌ট্রন্‌স্‌ পরীক্ষায় সাফল্যের পর হরিনাথ 1893 খ্রীস্টাব্দের 27 জুন সেন্ট্‌ জেভিয়ার্স কলেজে এফ্‌. এ. ক্লাসে ভর্তি হলেন। এই কলেজের ছাত্র হিসাবে তিনি 1894 খ্রীস্টাব্দে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের এফ্‌. এ. পরীক্ষায় প্রথম বিভাগে উত্তীর্ণ হন। মানের ক্রমানুসারে তাঁর নাম ছিল পনের জনের পরে এবং এই পরীক্ষায় তিনি একটি স্কলারশিপ্‌ পান। আর ইংরেজী ও লাতিন ভাষায় নৈপুণ্যের জন্য তিনি ডাফ্‌ স্কলারশিপ্‌ লাভ করেন। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে এই বছরে সেন্ট্‌ জেভিয়ার্স কলেজের একাত্তর জন পরীক্ষার্থীর মধ্যে একমাত্র হরিনাথই প্রথম বিভাগে উত্তীর্ণ হয়েছিলেন।

1895 খ্রীস্টাব্দে উত্তর কলকাতার গরানহাটার বসু পরিবারে হরিনাথের বিবাহ হয়। তাঁর পরমা সুন্দরী স্ত্রী শরৎশোভা দেবী ছিলেন কলকাতার এক সওদাগরী অফিসের ক্যাশিয়ার নন্দলাল বসুর একমাত্র কন্যা। প্রসঙ্গত বলা যায়, সংসারে দৈনন্দিন কাজকর্ম ছাড়া অন্যান্য বিষয়ে শরৎশোভার আগ্রহ ছিল সামান্যই। হরিনাথের স্ত্রীর বিদ্যাচর্চায় বিন্দুমাত্র অনুরাগ ছিল না।

এফ্‌. এ. পরীক্ষার পর হরিনাথ কলকাতার প্রেসিডেন্সি কলেজের তৃতীয় বার্ষিক শ্রেণীতে ভর্তি হন। তাঁর অনার্সের বিষয় ছিল লাতিন ও ইংরেজী সাহিত্য। এই কলেজে একদিন ভাষাতত্ত্বের ক্লাসে এক কৌতুককর ঘটনা ঘটে। অধ্যাপক এফ্‌. জে. রো (F. J. Rowe) ভাষাতত্ত্ব পড়ানোর সময় W = gu—ভাষাবিশেষে এই পরিবর্তনের রীতি সম্পর্কে ছাত্রদের কয়েকটি উদাহরণ দেন। আর ছাত্রদেরও তিনি

এ সম্বন্ধে দু একটি দৃষ্টান্ত দিতে বলেন। কোন ছাত্রই এ বিষয়ে প্রস্তুত ছিলেন না। হরিনাথ অবশ্য অধ্যাপকের অনুমতিক্রমে বোর্ডে গিয়ে পূর্বোক্ত ভাষাতাত্ত্বিক রীতি অনুযায়ী লিখলেন: Rowe=Rogue। এই ঘটনায় অধ্যাপক মহাশয় পরম উল্লসিত হয়ে তাঁকে সস্নেহে জড়িয়ে ধরেন। আর তারপর থেকে তিনি তাঁর এই প্রিয় ছাত্রকে 'সিসেরো' (Cicero) নামে অভিহিত করতেন।

1896 খ্রীস্টাব্দে হরিনাথ এই কলেজ থেকে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বি এ. পরীক্ষায় লাতিন ও ইংরেজী অনার্সে যথাক্রমে প্রথম শ্রেণীতে প্রথম ও চতুর্থ হন। আর তিনি মাসিক চল্লিশ টাকা বৃত্তিলাভ করেন। এই পরীক্ষার ফল প্রকাশিত হওয়ার পর পরীক্ষকপর্ষদের সদস্যেরা ইংল্যান্ডে উচ্চশিক্ষার জন্য ছ'জন গ্রাজুয়েটের নাম সুপারিশ করেন। হরিনাথ ছিলেন তাঁদের মধ্যে অন্যতম।

প্রসঙ্গত বলা যায় যে এই পরীক্ষায় হরিনাথ দর্শনশাস্ত্রে পাস করতে পারেননি। তাঁর অনার্সের বিষয় থেকে কিছু নম্বর কেটে তাঁকে পাস করিয়ে দেওয়া হয়। প্রায় এই একই ঘটনার দৃষ্টান্ত অবশ্য কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের গোড়াকার ইতিহাসে মেলে।

বি. এ. পরীক্ষার আট মাস পরে একই বছরে (1896) প্রাইভেট ছাত্র হিসাবে হরিনাথ কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের লাতিনে এম্. এ. পরীক্ষা দেন এবং প্রথম শ্রেণীতে প্রথম হন এবং স্বর্ণপদক লাভ করেন। এই পরীক্ষায় তিনি শতকরা সাতাত্তর নম্বর পেয়েছিলেন। ইতিপূর্বে তিনজন পরীক্ষার্থী এবং একজন পরীক্ষার্থিনীর কেউই এ বিষয়ে এত নম্বর পাননি।

1897 খ্রীস্টাব্দের 23 জানুয়ারি হরিনাথ প্রেসিডেন্সি কলেজ ইউনিয়নে ইতালীয় কাব্যসাহিত্যের শ্রেষ্ঠ প্রতিভা দান্তে আলিগিএরি (Dante Alighieri) সম্পর্কে এক গবেষণাপত্র পাঠ করেন। এই সভায় সভাপতিত্ব করেছিলেন কবি-অধ্যাপক মনোমোহন ঘোষ। হরিনাথের ইতালীয় ভাষাশিক্ষা বিষয়ে এক বিস্ময়কর বিবরণী পাওয়া যায়। মাত্র পনেরো দিনের চেষ্টায় তিনি ইতালীয় ভাষা শিখে ফেলেন।

এই বছরের বসন্তকালে হরিনাথ বিদ্যাচর্চার জন্য ইংল্যান্ড যাত্রা করলেন এবং 6 জুলাই তিনি কেমব্রিজের ক্রাইস্ট'স কলেজে ভর্তি হলেন। এই সময় তিনি গ্রীক ভাষাচর্চায় মনোযোগ দিলেন। এই বছরের 15 নভেম্বর এক বিশেষ ব্যবস্থানুসারে ক্রাইস্ট'স কলেজের ছাত্রাবস্থাতেই তিনি কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রীকে এম্. এ. পরীক্ষা দেন এবং প্রথম শ্রেণীতে উত্তীর্ণ হওয়ার কৃতিত্ব অর্জন করেন। আর অনায়াসেই তিনি লাভ করলেন এক স্বর্ণপদক। কলকাতার প্রেসিডেন্সি কলেজের প্রাক্তন অধ্যক্ষ চার্লস্ হেন্‌রি টনি (Charles Henry Tawney) এই পরীক্ষার প্রশ্নকর্তা ও পরীক্ষক মনোনীত হন। বলা বাহুল্য, তিনি এই সময় লনডনের ইন্‌ডিয়া অফিস লাইব্রেরির গ্রন্থাগারিক ছিলেন। পরবর্তীকালে এক প্রশংসাপত্রে তিনি এই পরীক্ষায় হরিনাথের নৈপুণ্যের প্রভূত প্রশংসা

করেন। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে হরিনাথের পূর্বে কোন পরীক্ষার্থীই কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রীক ভাষায় এম্ এ. পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হননি।

1898 খ্রীস্টাব্দে হরিনাথ ভারত সরকারের স্টেট স্কলারশিপ লাভ করেন। এবং বছরে দু'শ পাউণ্ড হিসাবে তিন বছরে তিনি মোট ছ'শ পাউণ্ড পান। হরিনাথের আগে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পাঁচজন ছাত্র এই স্কলারশিপ পেয়েছিলেন। তাঁরা হলেন যথাক্রমে যোগীন্দ্রনাথ দাস, আবদুল মজিদ, জে. প্লাটেল (J. Platel), অতুলচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ও যোগীন্দ্রনাথ পাল।

কেমব্রিজের ক্রাইস্ট'স কলেজ থেকে 1897 খ্রীস্টাব্দে হরিনাথ ম্যাট্রিকুলেশন পাস করেন। এবং এই বছরের 1 অক্টোবর তিনি কেমব্রিজের প্রখ্যাত অধ্যাপক জেম্স্ উইলিয়ম কার্টমেল (James William Cartmell)-এর ঘনিষ্ট সান্নিধ্যে বিদ্যাচর্চার সুযোগ পান। 1898 খ্রীস্টাব্দের 13 জুন তিনি এই কলেজের ফাউন্ডেশন্ স্কলার নির্বাচিত হন। এবং এই বছরেই তিনি লাতিন ও গ্রীক ভাষায় কবিতারচনার জন্য পুরস্কার পান। লাতিনে লেখা তাঁর কবিতার বিষয় ছিল 'দক্ষিণ আফ্রিকা'। 1899 খ্রীস্টাব্দে তিনি ক্রাইস্ট'স কলেজের সিনিয়র ক্ল্যাসিকল স্কলার নির্বাচিত হন। 1900 খ্রীস্টাব্দে তিনি এই কলেজের ছাত্র হিসাবে স্নাতক হন। এবং এই একই বছরে কেমব্রিজের ক্লাসিকল ট্রাইপস, প্রথম ভাগে প্রথম শ্রেণীতে উত্তীর্ণ হন। প্রসঙ্গত বলা যায় যে এই পরীক্ষায় মাত্র সাতজন পরীক্ষার্থী প্রথম শ্রেণীতে উত্তীর্ণ হওয়ার গৌরব অর্জন করেন। আর এই পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়ার পর খ্যাতনামা শিক্ষকেরা হরিনাথকে যেসব প্রশংসাপত্র দিয়েছিলেন তা থেকে ওই তরুণ বয়সে তাঁর ভাষা ও সাহিত্যে পাণ্ডিত্যের যথেষ্ট পরিচয় পাওয়া যায়। কেমব্রিজের কীর্তিমান শিক্ষাব্রতী জন্ পীল্ (John Peile) তাঁর এই প্রিয় ছাত্রটিকে যে প্রশংসাপত্রটি দেন তাতে তিনি স্পষ্টতই লেখেন, ইংল্যাণ্ডের শিক্ষাবিভাগে উচ্চপদ লাভের পক্ষেও হরিনাথের যোগ্যতা যথেষ্ট ছিল। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে ইতিপূর্বে মাত্র আর একজন ভারতীয় ছাত্র এই ট্রাইপস্ পরীক্ষায় সাফল্য অর্জন করেন। তিনি হলেন অরবিন্দ (শ্রীঅরবিন্দ) ঘোষ। 1892 খ্রীস্টাব্দে তিনি কেমব্রিজের কিংস কলেজ থেকে এই পরীক্ষা দেন এবং হরিনাথের মত তিনিও প্রথম শ্রেণীতে উত্তীর্ণ হন।

বাবার মনোবাসনা পূরণের আগ্রহে হরিনাথ ইতিপূর্বে আই. সি. এস্. পরীক্ষা দিয়েছিলেন। কিন্তু কোন স্থান লাভে অসমর্থ হন। পরবর্তীকালে তিনি এ বিষয়ে আর আগ্রহী হননি। প্রসঙ্গক্রমে উল্লেখ করা যায় যে 1900 খ্রীস্টাব্দে তিনি এক ঔপনিবেশিক চাকরির সুযোগ পেয়েছিলেন। কিন্তু তিনি তা গ্রহণ করেননি।

1901 খ্রীস্টাব্দে হরিনাথ কেমব্রিজের মধ্যযুগীয় ও আধুনিক ভাষাবলীর ট্রাইপসে দ্বিতীয় শ্রেণীতে উত্তীর্ণ হন। প্রসঙ্গত বলা যায় যে এই পরীক্ষায় মাত্র দুজন পরীক্ষার্থীই

প্রথম শ্রেণীতে উত্তীর্ণ হওয়ার সম্মান লাভ করেন। তাঁরা হলেন জে ডব্লিউ এইচ্. অ্যাট্‌কিনস্ (J. W. H. Atkins) এবং এইচ্. ব্রাউন্ (H. Brown)। প্রবীণ অধ্যাপক ওয়াল্টর উইলিয়ম স্কীট (Walter William Skeat) যিনি ইতিমধ্যে ছ'বার এই মধ্যযুগীয় ও আধুনিক ভাষাবলীর ট্রাইপসের পরীক্ষক নির্বাচিত হন, হরিনাথকে এই সময় একটি প্রশংসাপত্র দেন। এই প্রশংসাপত্র থেকে ওই পরীক্ষার দুরূহতা সম্পর্কে আমরা অনেকটা অবহিত হই। তাঁর বিবেচনায় এই কঠিন পরীক্ষায় উত্তীর্ণদের ইংরেজী ভাষা ও সাহিত্যের দায়িত্বশীল শিক্ষক নির্বাচন করা সমীচীন। এই বছর তিনি ক্রাইস্ট'স কলেজ থেকে শেক্‌সপিয়র ও চসর-সাহিত্যে পারদর্শিতার জন্য স্কীট পুরস্কার পান। ইসরাএল্ গোল্যান্ট্‌স (Israel Gollancz) এবং স্বয়ং উক্ত স্কীট সাহেব এই পুরস্কার বিষয়ে পরীক্ষক ছিলেন। আর এই বছরেই অ্যালেন রিসার্চ স্কলারশিপের জন্য হরিনাথের নাম সুপারিশ করলেন তিনজন প্রখ্যাত অধ্যাপক।

কেমব্রিজের সহপাঠী ও শিক্ষকেরা সকলেই হরিনাথের পাণ্ডিত্যে মুগ্ধ ছিলেন। বিখ্যাত লেখক জন্ ক্লার্ক স্টোবার্ট (John Clark Stobert) ছিলেন হরিনাথের সহপাঠী। তিনিও খুব ভাল ছাত্র ছিলেন। কিন্তু হরিনাথের কথা উঠলেই তিনি প্রশংসায় পঞ্চমুখ হতেন। তিনি স্বচ্ছন্দে বলতেন, হরিনাথের তুলনায় তিনি বা অন্যান্য সহপাঠীরা ছিলেন নগণ্য। হেনরি জন্ এডওয়ার্ডস্ (Henry John Edwards) বহুকাল ধরে কেমব্রিজে শিক্ষকতা করেছেন। তাঁর পক্ষে তাই অনেক মেধাবী ছাত্রের সংস্পর্শে আসা খুব স্বাভাবিক। কিন্তু তিনি স্পষ্টতই বলতেন, হরিনাথের মতন অসাধারণ মেধাবী ছাত্র তিনি আর একটিও দেখেননি।

কেমব্রিজে ছাত্রাবস্থায় হরিনাথ ইওরোপের আরও কয়েকটি সম্ভ্রান্ত বিদ্যাপীঠে সাময়িক পাঠগ্রহণ করেন। 1897 খ্রীস্টাব্দে প্যারিসের সরবনে তিনি আসিরীয় বিদ্যাচর্চায় প্রতিষ্ঠিত ঝোআশ্যাঁ মেনাঁ (Joachim Menant)-র সহায়তায় বিদ্যার্জন করেছিলেন। পরের বছর জার্মানীর মারবুর্গ বিশ্ববিদ্যালয়ে তিনি সংস্কৃত, তুলনামূলক ভাষাতত্ত্ব এবং ভাষাশিক্ষণ পদ্ধতি বিষয়ে পাঠগ্রহণ করেন। জন্ পীলের প্রশংসাপত্র থেকে জানা যায়, ক্রাইস্ট'স কলেজের দুটি দীর্ঘ ছুটির অবকাশ হরিনাথ কাটান ফ্রান্স ও জার্মানীতে এবং এই উভয় দেশের ভাষায় তিনি পরিপূর্ণ দক্ষতা অর্জন করেন; তদুপরি এই দুই দেশের কথ্য ভাষাতেও তাঁর অধিকার ছিল অসামান্য। আর এই বছরেই তিনি আরবী ভাষায় অধিকতর পারদর্শিতার জন্য মিশরে ছিলেন।

মধ্যযুগীয় ও আধুনিক ভাষাবলীর ট্রাইপসে সাফল্যের পূর্বেই হরিনাথ ভারতীয় শিক্ষাবিভাগে চাকরি করবেন বলে মনস্থ করেছিলেন। এই সূত্রে বিশিষ্ট শিক্ষাব্রতী কর্তৃক প্রদত্ত এগারটি প্রশংসাপত্রে তাঁর বিস্ময়কর মেধা এবং বহুভাষায় তাঁর অসাধারণ দক্ষতার অনেক নজির মেলে। এডওয়ার্ড বাইল্‌স কাউএল (Edward Byles

Cowell)-এর এক প্রশংসাপত্র থেকে জানা যায়, হরিনাথ তাঁর কাছে সংস্কৃত ভাষা এবং বিশেষভাবে ঋগ্‌বেদচর্চা করেন। তুলনামূলক ভাষাতত্ত্বে হরিনাথের অসামান্ত অধিকার তাঁকে মুগ্ধ করেছিল। অ্যান্টনি অ্যাশ্‌লি বেভন (Anthony Ashley Bevan) তাঁর প্রশংসাপত্রে লিখেছেন, হরিনাথ কয়েক মাস তাঁর কাছে আরবী ভাষাচর্চা করেন। আর এই ভাষা শেখার শুরু থেকেই তিনি তাঁর এই ছাত্রের অনুরাগ ও দক্ষতায় অবাক হয়ে যান। এল্. বোকেল (L. Boquel) এক প্রশংসাপত্রে ফরাসী ভাষায় হরিনাথের অসাধারণ পারদর্শিতার কথা উল্লেখ করেছেন। দীর্ঘদিন তাঁর কেমব্রিজ বসবাসে তিনি কদাচিৎ একজন ইংরেজ ছাত্র পেয়েছেন যিনি হরিনাথের মত কথ্য ও সাধু ফরাসীতে সমপরিমাণে পারদর্শী। এডওয়ার্ড সেমুর টমসন (Edward Seymer Thompson) তাঁর প্রশংসাপত্রে বিশেষভাবে লেখেন যে গ্রীক ও লাতিন ভাষায় হরিনাথের ছন্দোবদ্ধ কবিতা রচনার এক দুর্লভ ক্ষমতা ছিল। আরবী ও পারসীক অভিধানপ্রণেতা এফ্. স্টাইন্‌গাস্ (F. Steingass) তাঁর প্রশংসাপত্রে মন্তব্য করেছেন যে কদাচিৎ তিনি হরিনাথের মত একজন ছাত্রের দেখা পেয়েছেন যাঁর আরবী ভাষা ও সাহিত্যে এরূপ প্রগাঢ় জ্ঞান ছিল। ইসরাএল গোল্যান্‌ট্‌স তাঁর প্রশংসাপত্রে লিখেছেন যে হরিনাথের মত সংস্কৃতিবান্ ছাত্রের দেখা তিনি কদাচিৎ পেয়েছেন। আর ভারতীয় শিক্ষাবিভাগের যে কোনো গুরুত্বপূর্ণ পদের জন্য তিনি তাঁর ছাত্রের নামটি বিশেষভাবে সুপারিশ করেন।

কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় এই যে ভারতীয় শিক্ষাবিভাগে চাকরিলাভের (1 ডিসেম্বর 1901) পরেও হরিনাথ বিভিন্ন জটিল ভাষার পরীক্ষা দিতে অত্যন্ত আগ্রহী ছিলেন। 1905 খ্রীস্টাব্দে কলকাতার প্রেসিডেন্সি কলেজে অধ্যাপনাকালে তিনি সংস্কৃত, আরবী ও ওড়িয়া ভাষাতে হাই প্রফিশিয়েন্সি পরীক্ষা দেন। আর এই তিনটি পরীক্ষায় কৃতিত্বের জন্য তিনি ভারত সরকার অনুমোদিত যথাক্রমে দু হাজার, দু হাজার ও এক হাজার টাকা পুরস্কার পান। প্রসঙ্গত বলা যায় যে ভারতীয় শিক্ষাবিভাগের পদস্থ কর্মচারীদের মধ্যে প্রাচ্য ভাষাচর্চার আগ্রহ বাড়ানোর জন্য সমসাময়িক সরকার কর্তৃক এই হাই প্রফিশিয়েন্সি এবং ডিগ্রী অব্ অনার পরীক্ষা প্রবর্তিত হয়।

1906 খ্রীস্টাব্দে হরিনাথ যখন হুগলি কলেজের অস্থায়ী অধ্যক্ষের পদে আসীন সেই সময় তিনি প্রাইভেট ছাত্র হিসাবে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের পালি ভাষায় এম্. এ. পরীক্ষা দেন। এই পরীক্ষার পরীক্ষক ছিলেন পালি ভাষা ও সাহিত্যে সুবিখ্যাত পণ্ডিত টমাস্ উইলিয়ম্ রীস্ ডেভিডস্ (Thomas William Rhys Davids)। আর আশ্চর্যের বিষয় হল, এই এম্. এ. পরীক্ষার ষষ্ঠপত্রে সংবলিত "ধনিয়সুত্তে"-র অংশবিশেষের (বত্রিশ পঙক্তি) হরিনাথ পরীক্ষার হলে বসেই ইংরেজীতে ছন্দোবদ্ধ অনুবাদ লেখেন। এই পরীক্ষায়, বলা বাহুল্য, তিনি প্রথম শ্রেণীতে প্রথম হন। আর স্বভাবতই সর্বোচ্চস্থান অধিকারের জন্য তিনি একটি স্বর্ণপদক লাভ করেন। এই পরীক্ষায় তৃতীয়

শ্রেণীতে উত্তীর্ণ হন গিরীন্দ্রকুমার সেন। ইতিপূর্বে মাত্র একজন পরীক্ষার্থীই কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের পালিতে এম্. এ. পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়েছিলেন (1901)। তিনি হলেন সতীশচন্দ্র আচার্য যিনি পরবর্তীকালে 'বিদ্যাভূষণ' উপাধিতে সমধিক খ্যাত। বলা বাহুল্য তিনিও হরিনাথের মত প্রথম শ্রেণীতে উত্তীর্ণ হওয়ার সম্মানলাভ করেন।

1907 খ্রীস্টাব্দের 23 ফেব্রুয়ারি ইমপিরিয়াল লাইব্রেরির গ্রন্থাগারিক পদলাভের কয়েক মাসের মধ্যেই হরিনাথ আরবী ভাষায় ডিগ্রী অব্ অনার পরীক্ষা দেন। এই পরীক্ষায় পরীক্ষার্থীদের ভাষাজ্ঞান জানার পদ্ধতিটি ছিল কঠিন। পরীক্ষকরা নোকৃতাবিহীন আরবী লেখা পরীক্ষার্থীদের পড়তে দিতেন। নোকৃতা ব্যতীত সঠিক আরবী পড়া অসাধ্যসাধন। কারণ আরবী শব্দের যথাযথ অর্থ বুঝতে নোকৃতা অনিবার্য ; অন্যথায় অর্থের তারতম্য ঘটার সম্ভাবনা পুরোপুরি। হরিনাথ এই পরীক্ষাতে প্রথম বিভাগে উত্তীর্ণ হন এবং ভারত সরকার অনুমোদিত পাঁচ হাজার টাকা পুরস্কার পান (27 জুলাই 1907)।

এই বছরেই হরিনাথ কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের হিব্রুতে এম্. এ. পরীক্ষা দিতে মনস্থ করেন। এবং এ বিষয়ে তিনি বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের অনুমতির জন্য এক আবেদনপত্রও পেশ করেছিলেন। কিন্তু 1907 খ্রীস্টাব্দের 6 এপ্রিল সিন্ডিকেটের অধিবেশনে 1907 অথবা 1908 খ্রীস্টাব্দে তাঁকে এই পরীক্ষার অনুমতি দেওয়ার বিষয়টি মুলতুবি রাখা হয়। আর তাই শেষ পর্যন্ত হরিনাথের হিব্রুতে এম্. এ. পরীক্ষা দেওয়ার বাসনা পূর্ণ হল না। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে ইতিমধ্যে তিনি এই বিশ্ববিদ্যালয়ে হিব্রুসহ সমস্ত বিদ্যাপর্ষদের সদস্য ছিলেন (1906-1907)।

1908 খ্রীস্টাব্দে নন-কলিজিয়েট ছাত্র হিসাবে হরিনাথ কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সংস্কৃতের 'এ' এবং 'ই' শাখায় এম্. এ. পরীক্ষা দেন। তাঁর সংস্কৃতে এই এম্. এ. পরীক্ষা দেওয়ার কারণটি খুব মজার। একবার কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সংস্কৃত পরীক্ষার প্রশ্নপত্র খুব কঠিন হয়। সেনেটের সদস্য হিসাবে হরিনাথ স্বভাবতই এর তীব্র সমালোচনা করেন। তাঁর এই সমালোচনা পণ্ডিত মহলে বেশ চাঞ্চল্যের সৃষ্টি করেছিল। পণ্ডিতেরা অবশ্য তাঁর মত অস্বীকার করেন। শুধু তাই নয়, তাঁরা হরিনাথের সংস্কৃত ভাষায় অধিকার সম্পর্কে সন্দেহ প্রকাশ করে বিরূপ মন্তব্য করেন। হরিনাথ তখন এইসব পণ্ডিতদের সন্দেহ দূর করার জন্য একই বছরে সংস্কৃতের দুটি শাখাতে এম্. এ. পরীক্ষা দেন। আর খুব সহজে তিনি এই দুই শাখাতে প্রথম শ্রেণীতে প্রথম হন এবং দুটি স্বর্ণপদক লাভ করেন। এই দুই শাখার পরীক্ষাতে দেশীবিদেশী বিখ্যাত পণ্ডিতেরা পরীক্ষক নিযুক্ত হন। সংস্কৃতের 'এ' শাখার পরীক্ষায় অন্যতম পরীক্ষার্থী ছিলেন গণনাথ সেন। এই পরীক্ষার্থীই পরবর্তীকালে মাত্র উনচল্লিশ বছর বয়সে 'মহামহোপাধ্যায়' উপাধি লাভ করেন। গণনাথ প্রথম শ্রেণীতে উত্তীর্ণ হলেও তাঁর স্থান ছিল হরিনাথের পরে।

প্রসঙ্গত বলা যায় যে ইতিপূর্বে মাত্র আর একজন ছাত্র একই বছরে দুটি বিষয়ে এম্. এ. পরীক্ষা দেন। তিনি হলেন কৃষ্ণপ্রসাদ দে। 1899 খ্রীস্টাব্দে তিনি পদার্থবিদ্যার 'সি' এবং গণিতশাস্ত্রের 'এ' শাখায় এম্ এ. পরীক্ষা দিয়ে হরিনাথের মতই দুই শাখাতে প্রথম শ্রেণীতে প্রথম হওয়ার গৌরব অর্জন করেন। হরিনাথের সংস্কৃতে এই এম. এ. পরীক্ষা সম্পর্কে অধ্যক্ষ সুরেশচন্দ্র সেনগুপ্ত এক চাক্ষুষ বিবরণী রেখে গেছেন। সুরেশচন্দ্র ছিলেন হরিনাথের ছাত্র। কিন্তু তিনিও হরিনাথের সঙ্গে এই একই বছরে এম্.এ. পরীক্ষা দেন। সুরেশচন্দ্রের লেখা থেকে জানা যায় যে পরীক্ষার সময় হরিনাথ সমস্তক্ষণ লিখতেন না বা সিটে বসে থাকতেন না। তিনি সেনেট হলে পায়চারি করতেন। আর তাঁর ছাত্রদের পাশ দিয়ে হেঁটে যাওয়ার সময় তিনি খোঁজ নিতেন তাঁরা কে কেমন লিখছেন।

সংস্কৃতের দুই শাখাতে এম্. এ. পরীক্ষায় শীর্ষস্থান অধিকার করেও হরিনাথ ক্ষান্ত হননি। পরের বছর তিনি সংস্কৃতে ডিগ্রী অব অনার পরীক্ষা দেন এবং অক্লেশেই ভারত সরকার অনুমোদিত পাঁচ হাজার টাকা পারিতোষিক লাভ করেন। এই সময় তাঁর বয়স বত্রিশ বছর। বলা বাহুল্য, মাত্র আর দু বছর ছিল তাঁর আয়ু অবশিষ্ট। তৎসত্ত্বেও শিক্ষাগত সাফল্যে তাঁর আগ্রহ ছিল অদম্য এই বছরেই হরিনাথ কলকাতা বিশ্ব-বিদ্যালয়ের পি. এইচ্. ডি. উপাধিলাভের আকাঙ্ক্ষায় এক গবেষণাপত্র পেশ করেন। তাঁর এই গবেষণাকর্ম পরীক্ষার জন্য বিশ্ববিদ্যালয়ের রেজিস্ট্রার স্বভাবতই সিন্‌ডিকেটকে এক পরীক্ষকপর্ষদ নিয়োগের অনুরোধ জানান (5 মার্চ 1909)। আর এই সূত্রে তিনজন খ্যাতনামা জার্মান পণ্ডিত হরিনাথের গবেষণা পরীক্ষার জন্য নির্বাচিত হন। তাঁরা হলেন যথাক্রমে গেঅর্গ তিবো, হেরমান্ ইয়াকোবি (Hermann Jacobi) এবং অটো ফ্রাঙ্কে (Otto Franke)।

এই সময় (1909-1910) হরিনাথ চীনা ভাষায় বিশেষ দক্ষতা অর্জনের জন্য আগ্রহী হন। তাঁর ইচ্ছা ছিল কেমব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের চীনা ভাষা ও সাহিত্যের সুবিখ্যাত অধ্যাপক হার্বার্ট অ্যালেন্ জাইলস্ (Herbert Allen Giles)-এর কাছে চীনা ভাষা শেখার। আর তাঁর এই বাসনার কথা জানতে পেরে অধ্যাপক মহাশয় সানন্দে রাজীও হয়েছিলেন। কেননা কেমব্রিজের প্রায় সমস্ত অধ্যাপকের কাছেই হরিনাথ বিশেষভাবে পরিচিত ছিলেন। কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে নানাবিধ সমস্যার জন্য তাঁর এই ইচ্ছা আর পূর্ণ হয়নি। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে ইতিমধ্যেই হরিনাথ চীনা ভাষার প্রাথমিক জ্ঞান অর্জন করেন।

চৌত্রিশ বছরের জীবৎকালের মধ্যে ভাষা ও বিদ্যাচর্চায় হরিনাথের মত বিস্ময়কর সাফল্য সর্বদেশে এবং সর্বকালেই বিরল। আর নিছক শিক্ষাগত যোগ্যতাতেও তাঁর তুল্য মানুষ খুব কমই মেলে।

অনন্য অধ্যাপনা

1901 খ্রীস্টাব্দের 21 জুলাই হরিনাথ লন্‌ডন্ থেকে তাঁর বাবাকে একটি চিঠি লেখেন। এই চিঠি থেকে জানা যায় যে তিনি ভারতীয় শিক্ষাবিভাগে চাকুরি করতে খুবই আগ্রহী। তাই তিনি এই সময় ইন্‌ডিয়া অফিসে রাষ্ট্রসচিব জর্জ হ্যামিল্‌টন্ (George Hamilton)-এর কাছে একটি আবেদনপত্র (20 জুলাই 1901) পেশ করেন। এই আবেদনপত্রের সঙ্গে হরিনাথ অনেকগুলি প্রশংসাপত্র পাঠান। পূর্বেই বলা হয়েছে যে এইসব প্রশংসাপত্রে কেমব্রিজের বিখ্যাত শিক্ষকেরা বিভিন্ন ভাষা ও সাহিত্যে হরিনাথের অসাধারণ জ্ঞান ও দক্ষতার কথা লেখেন। কেমব্রিজের বিশিষ্ট শিক্ষক জন্ পীলের প্রশংসাপত্র থেকে আমরা জানতে পারি যে ইংল্যান্‌ডের শিক্ষাবিভাগে উচ্চপদ লাভের পক্ষেও হরিনাথের যোগ্যতা যথেষ্ট ছিল। কিন্তু তিনি সত্বর স্বদেশে ফিরে ইংরেজী ভাষা ও সাহিত্যে অধ্যাপকের অভাব পূরণ করতে চাইলেন। ইতিমধ্যে ভারতীয় শিক্ষাবিভাগে স্যামুএল্ চার্লস্ হিল্ (Samuel Charles Hill) স্থায়ীভাবে রেকর্ডরক্ষকের পদলাভ করেন। আর তাই ভারত সরকারের সচিব তাঁর চিঠিতে (21 জুলাই 1901) একটি শূন্যপদের কথা রাষ্ট্রসচিবকে জানান। এই সূত্রে 1901 খ্রীস্টাব্দের 18 অক্টোবর রাষ্ট্রসচিব ভারতের বড়লাট জর্জ ন্যাথানিএল্ কার্জন্ (George Nathaniel Curzon)-কে জানালেন হরিনাথের নিয়োগের কথা। এই নিয়োগপত্রে তিনি স্পষ্টত একথাও লিখলেন যে হরিনাথের মাহিনার পরিমাণ হবে ঊর্ধ্বতন ইওরোপীয় কর্মচারীদের বেতনানুসারে। আর এ বিষয়ে হরিনাথ ও রাষ্ট্রসচিবের মধ্যে এক চুক্তি সম্পাদিত হয়। এই চুক্তির শর্তানুসারে তিনি ভারত সরকারের কাছ থেকে মাসিক পাঁচশ টাকা বেতন পাবেন। তদুপরি বাৎসরিক পঞ্চাশ টাকা হারে বৃদ্ধি পেয়ে তাঁর মাহিনার পরিমাণ হবে সাতশ টাকা। আর তিনি যদি তাঁর এই কাজে পাঁচ বছরের বেশী সময় বহাল থাকেন তাহলে এক্ষেত্রেও তাঁর বেতন হাজার টাকা পর্যন্ত বার্ষিক পঞ্চাশ টাকা হারে বৃদ্ধি পাবে। প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য যে হরিনাথের এই নিয়োগের খবরে লর্ড কার্জন্ খুব খুশী হন।

উক্ত নিয়োগের ভিত্তিতে 1901 খ্রীস্টাব্দের 1 ডিসেম্বর হরিনাথ আই. ই. এস্. হয়ে স্বদেশে ফেরেন এবং 7 ডিসেম্বর ঢাকা কলেজে ইংরেজী ভাষা ও সাহিত্যের অধ্যাপক হিসাবে যোগদান করেন। ভারতীয়দের মধ্যে তিনিই প্রথম আই. ই. এস্. যাঁর নিয়োগ সরাসরি ইংল্যান্‌ড্ থেকে হয়। এই কলেজে অধ্যাপনা করার সময় তিনি

মাস ছয়েক কবি মনোমোহন ঘোষকেও অন্যতম সহকর্মী হিসাবে পেয়েছিলেন। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে হরিনাথের গুণমুগ্ধ বন্ধুরা সকলে শুধুমাত্র এই কলেজের অধ্যাপনার কাজেই যুক্ত ছিলেন না; ঢাকার নবাব সলিমুল্লা খান বাহাদুর, ম্যাজিস্ট্রেট জেমস্ টমসন্ র‍্যাংকিন্ (James Thomson Rankin) প্রমুখের সঙ্গে তাঁর ঘনিষ্ঠ বন্ধুত্ব ছিল। এই সময় ভারতের বড়লাট লর্ড কার্জন্ ঢাকা পরিদর্শনে যান (1901)। তিনি হরিনাথের সঙ্গে সাক্ষাতের ইচ্ছা প্রকাশ করেন। কেননা হরিনাথ আরবী ও পারসীক ভাষা থেকে অনূদিত তাঁর একখানি পুস্তিকা কার্জন্‌কে উপহার দেন। এই অনুবাদের উৎসর্গপত্রটি তিনি লাতিন ভাষায় লেখেন। এবং এই উৎকৃষ্ট লাতিন পড়ে কার্জন্ মুগ্ধ হন। ঢাকা কলেজের তখন অধ্যক্ষ ছিলেন প্রসন্নকুমার রায়। তিনি তৎক্ষণাৎ কার্জনের এই ইচ্ছার কথা জানিয়ে হরিনাথের কাছে লোক পাঠালেন। হরিনাথ সে সময় হাঁপানিতে প্রায় শয্যাশায়ী। তিনি তখন মাঝে মাঝে হাঁপানিতে খুব ভুগতেন। অত্যন্ত দুঃখের সঙ্গে অধ্যক্ষ রায়কে তাই হরিনাথ জানালেন যে শারীরিক অসুস্থতার জন্য তিনি বড়লাটের সঙ্গে দেখা করতে অসমর্থ। কিন্তু কার্জনের আগ্রহ দেখে অধ্যক্ষ রায় এই সাক্ষাতের ব্যাপারে হরিনাথের কাছে আবার লোক পাঠান। শেষপর্যন্ত হরিনাথ সেই অসুস্থ শরীরেই কার্জনের সঙ্গে দেখা করলেন। বলা বাহুল্য, তাঁর সঙ্গে আলাপে কার্জন্ খুব খুশী হন।

অধ্যাপক হিসাবে হরিনাথের কৃতিত্বের পরিচয় পাওয়া যায় তাঁর ছাত্রদের স্মৃতিকথায়। এ সম্পর্কে তাঁর ছাত্র অধ্যক্ষ সুরেশচন্দ্র সেনগুপ্ত লিখেছেন: "আমি তখন ঢাকা কলেজের প্রথম বার্ষিক শ্রেণীর ছাত্র (1903)। সেই সময় আ ম প্রথম মহামতি হরিনাথ দে-কে দেখি। আমি তাঁকে একটি বইয়ের মধ্যে মুখ ডুবিয়ে থাকতে দেখেছিলাম। তিনি তাঁর ক্লাস্ নিতে যাচ্ছিলেন। আমি তাঁকে আগে কখনও দেখিনি। তাই কৌতূহলবশত ভাবছিলাম ব্যক্তিটি কে হতে পারেন। আমি ছিলাম অলিন্দে দাঁড়িয়ে। তিনি যখন আমাদের ক্লাসে ঢুকতে গেলেন, আমি তাঁর পিছু পিছু তাড়াতাড়ি এসে সিটে বসে পড়লাম। তিনি তাঁর পড়ানো শুরু করলেন। তাঁর পড়ানোয় কোনো বহ্বারম্ভ বা আতিশয্য ছিল না। আমাদের পড়ার বিষয় ছিল Enoch Arden। তিনি তাতে একেবারে মগ্ন হয়ে গেলেন। অত্যন্ত পাণ্ডিত্য সহকারে তিনি কথার পর কথা, বাক্যাংশের পর বাক্যাংশ ও বাক্যের পর বাক্য বিশ্লেষণ করে চললেন। এই রকম পাণ্ডিত্যপূর্ণ অধ্যাপনার সঙ্গে ইতিপূর্বে আমাদের পরিচয় ঘটেনি।...

"ক্রমে ক্রমে আমরা তাঁর বিশাল বিদ্যাবত্তার পরিচয় পেতে থাকলাম। পরিচয় পেলাম বহু ভাষায় তাঁর অসামান্য অধিকার ও দক্ষতার। কিন্তু তাঁর কোনো অহঙ্কার ছিল না। চিন্তায় মগ্ন হয়ে তিনি মাথাটি নীচু করে হেঁটে যেতেন। পড়ানোর সময়

তিনি অজস্র উদ্ধৃতির সাহায্যে তাঁর বক্তব্যকে প্রাঞ্জল করে তুলতেন। খুব স্বাভাবিক-ভাবেই তাঁর কথায় এই উদ্ধৃতির পর উদ্ধৃতি আসত।

"কিন্তু তাঁকে আমাদের মধ্যে বেশিদিন পাওয়ার সৌভাগ্য হল না। খুব শীঘ্রই তিনি প্রেসিডেন্সি কলেজে বদলি হয়ে গেলেন যে অল্প সময় তিনি আমাদের মধ্যে ছিলেন তার মধ্যেই তিনি ছাত্রদের খুব প্রিয় হয়ে উঠেছিলেন। তার কারণ নিজের অসাধারণত্ব সম্পর্কে তিনি একেবারেই সচেতন ছিলেন না।"

অধ্যাপক হিসাবে হরিনাথের এই জনপ্রিয়তা মোটেই আকস্মিক নয়। ঢাকা কলেজে অধ্যাপনার কাজে যোগ দিয়েই তিনি ছাত্রদের জন্য নির্দিষ্ট ইংরেজী সাহিত্যের কয়েকটি পাঠ্যপুস্তকের নূতন সংস্করণ প্রকাশনায় নিজেকে নিয়োজিত করেন। 1902 খ্রীস্টাব্দে তাঁর নিপুণ সম্পাদনায় *Macaulay's Essay on Milton* প্রকাশিত হয়। সুবিখ্যাত ইংরেজ কবি জন্ মিল্‌টন্ (John Milton) সম্পর্কে মেকলে সাহেবের এই রচনা খুবই জটিল। মেকলে ছিলেন ইংরেজ ঐতিহাসিক। বহু ভাষায় ও বহু বিদ্যায় তাঁর অধিকার ছিল। আর তাই তাঁর রচনায় স্বভাবতই এসেছে সমস্ত যুগের ও সমস্ত কালের কথা। তাঁর লেখা প্রবন্ধগুলি ঠিক শিক্ষামূলক ইতিহাস নয়। তাঁর প্রবন্ধের সঙ্গে যথার্থই তুলনা করা যায় স্বয়ং মিল্‌টনের লেখার। উভয়েরই রচনায় বিষয়ের বিস্তার এবং বিস্তাবত্তা বর্তমান। বিশেষত টীকা ছাড়া তাই মেকলের রচনার অর্থোদ্ধার করা অত্যন্ত কঠিন। ছাত্রদের এই অসুবিধার কথা ভেবেই হরিনাথ এ কাজে হাত দেন। আর ছাত্রদের বোঝবার সুবিধার জন্য এই রচনা সম্পাদনায় তিনি অপরিসীম পরিশ্রম করেন। এই গ্রন্থের ভূমিকা, টীকা, সংক্ষিপ্তসার, পরিশিষ্ট প্রভৃতি অংশে হরিনাথের পাণ্ডিত্য ও দক্ষতার যথেষ্ট পরিচয় পাওয়া যায়। মূল গ্রন্থে ব্যবহৃত অসংখ্য জটিল কথার তিনি সঠিক ব্যাখ্যা করেছেন। সর্বোপরি মূল রচনায় গ্রীক, লাতিন, ইংরেজী, ইতালীয়, ফরাসী, পর্তুগীজ, জার্মান প্রভৃতি সাহিত্যের যেসব অংশের উল্লেখ আছে, সেগুলিরও তিনি বিশদ বিবরণ দিয়েছেন। এমন কি মেকলে লিখিত ভুল তথ্যগুলিও শুধরে দিয়েছেন হরিনাথ। তাই কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বি. এ. পরীক্ষার্থীদের সুবিধার জন্য সম্পাদিত হলেও উৎসুক পাঠকের কাছে এ গ্রন্থ আজও খুব মূল্যবান্। 1903 খ্রীস্টাব্দে হরিনাথের বিখ্যাত *Lecture Notes on Palgrave's Golden Treasury, Book IV* প্রকাশিত হয়। ফ্রান্সিস্ টার্নার পল্‌গ্রেভ্ (Francis Turner Palgrave) ছিলেন ইংরেজ কবি ও সমালোচক। অবশ্য কবিতা রচনার চেয়ে সমালোচনায় তাঁর কৃতিত্ব অনেক বেশী। অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ে তিনি কবিতার অধ্যাপক ছিলেন। পল্‌গ্রেভের পাণ্ডিত্যের স্বাক্ষর তাঁর সমালোচনা সাহিত্যের সর্বত্রই পাওয়া যায়। কিন্তু তাঁর প্রধান কৃতিত্ব ইংরেজী কবিতার এই সংকলনে সুস্পষ্ট। তাঁর *Golden Treasury* নিঃসন্দেহে শ্রেষ্ঠ ইংরেজী কাব্য-সঞ্চয়ন। শুধু তাই নয়,

তাঁর এই বিখ্যাত সংকলন প্রকাশের পর কবিতায় অনুরাগ বৃদ্ধি পায়। আজও পাঠক-সমাজে তাঁর এই কাব্য-সংকলন শ্রেষ্ঠত্বের আসনে প্রতিষ্ঠিত। আর হরিনাথ সম্পাদিত এই গ্রন্থটিও নানাকারণে মূল্যবান্। প্রায় পাঁচশ পাতার ই গ্রন্থের ভূমিকা, টীকা ও সংক্ষিপ্তসার অংশগুলি ছাত্রদের পক্ষে খুবই উপযোগী। সর্বোপরি বিভিন্ন দেশের সাহিত্য সম্পর্কে তাঁর ছাত্রদের আগ্রহী করার জন্য তিনি এই গ্রন্থে এক অপূর্ব পদ্ধতি আবিষ্কার করেন। ইংরেজী কবিতা আলোচনার সময় তিনি গ্রীক, লাতিন, সংস্কৃত, আরবী, পারসীক, জার্মান, ইতালীয়, স্পেনীয় প্রভৃতি সাহিত্য থেকে অজস্র স্বচ্ছন্দ উপমা দিয়েছেন। এই ধরনের পাণ্ডিত্যপূর্ণ সম্পাদনা পৃথিবীর সব দেশেই দুর্লভ। কেননা প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের উভয় সাহিত্যে অসাধারণ জ্ঞান না থাকলে এই অসংখ্য তুলনা মনে আসা সম্ভব নয়। বলা বাহুল্য, হরিনাথের বিস্ময়কর স্মৃতিশক্তি এ বিষয়ে তাঁর খুবই সহায়ক হয়েছিল। অধ্যক্ষ চার্লস্ হেন্‌রি টনি এই সম্পাদনায় খুব মুগ্ধ হন। ইংল্যান্ড্ থেকে এক ব্যক্তিগত চিঠিতে তিনি হরিনাথের পাণ্ডিত্যের ভূয়সী প্রশংসা করেন। অন্যান্য বিষয়ের মধ্যে তিনি লিখেছিলেন যে এই বই পড়লে ছাত্রদের আর ইংরেজী সাহিত্যের ইতিহাস পড়ার দরকার হবে না। বিখ্যাত সমালোচক এড্‌ওয়ার্ড ডাউডেন্ (Edward Dowden)-ও এই সম্পাদনায় হরিনাথের খুব প্রশংসা করেন। 904 খ্রীস্টাব্দে হরিনাথের *Lecture Notes on Typical Selections* প্রকাশিত হয়। তাঁর এই সম্পাদিত গ্রন্থটিও ছাত্রসমাজে খুব জনপ্রিয়তা লাভ করেছিল।

ঢাকা কলেজে অধ্যাপক হিসাবে যোগদান করার অল্পকাল পরেই হরিনাথ কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্গে যুক্ত হন। 1902 খ্রীস্টাব্দে তিনি বিশ্ববিদ্যালয়ের এফ্. এ. (লাতিন) এবং বি. এ. (গ্রীক) পরীক্ষার পরীক্ষক নিযুক্ত হলেন। আর এই সময় থেকে প্রায় আজীবন তিনি এই বিশ্ববিদ্যালয়ের সেবায় ব্রতী ছিলেন। 1903 খ্রীস্টাব্দে তিনি এনট্রান্স (গ্রীক), এফ্. এ. (লাতিন) এবং বি. এ (ইংরেজী ও গ্রীক) পরীক্ষার পরীক্ষক নির্বাচিত হন। পরের বছরও এইভাবে হরিনাথ এনট্রান্স (গ্রীক), এফ্. এ (লাতিন, বি এ. (গ্রীক) এবং এম্ এ. (লাতিন পরীক্ষার পরীক্ষক ছিলেন। কেননা এই সময় কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়েও শুধুমাত্র পরীক্ষা গ্রহণের কাজই হত। ভারতের অন্যান্য বিশ্ববিদ্যালয়ে তখন কোনরূপ শিক্ষাদানের ব্যবস্থা ছিল না।

1905 খ্রীস্টাব্দের 8 অক্টোবর হরিনাথ ঢাকা কলেজ থেকে কলকাতার প্রেসিডেন্সি কলেজে বদলি হন। ইতিমধ্যেই অবশ্য অধ্যাপক ও পণ্ডিত হিসাবে তাঁর খ্যাতি কলকাতার ছাত্রসমাজেও ছড়িয়ে পড়ে। এই প্রসঙ্গে হরিনাথের ছাত্র অঘোরনাথ ঘোষ লিখেছেন: "একদিন শুনিলাম ঢাকা কলেজ থেকে প্রফেসার হরিনাথ দে আমাদের পড়াইতে আসিতেছেন। ইতিপূর্বেই আমরা তাঁহার বিশ্ববিখ্যাত নাম শুনিয়াছিলাম। এক্ষণে সকলেই অত্যন্ত ঔৎসুক্যের সহিত তাঁহার আগমন প্রতীক্ষা করিতে লাগিলাম।

সাধারণত নূতন শিক্ষক প্রথম আসিলে ছেলেরা তাঁহাকে একটু জ্বালাতন করে, কিন্তু আমার বেশ মনে পড়ে, হরিনাথ দে যখন প্রথম পড়াইতে আসেন সেদিন ছেলেরা কোনও রকম গোলমাল করে নাই। জানি না তাঁহার বিশাল চক্ষু দুটির ভিতর কেমন একটা জ্যোতি ছিল, তাঁহার কণ্ঠের স্বরে কেমন একটা গাম্ভীর্য ছিল, ছেলেরা সকলেই বেশ মনোযোগের সহিত তাঁহার নিকট পাঠ গ্রহণ করিয়াছিল। সে সময়ে মিল্টনের 'কোমাস' ও হেল্পসের 'এসেস' আমাদের পাঠ্যপুস্তক ছিল। তিনি সেই পুস্তক দুখানি আমাদিগকে পড়াইতেন। গ্রীক ও ল্যাটিন ভাষায় সুপণ্ডিত বলিয়া কোমাসের allusion-গুলি তিনি এত ভাল করিয়া বুঝাইয়া দিতেন যে আর দ্বিতীয়বার পড়িবার প্রয়োজন হইত না।"

হরিনাথের ছাত্রদের সকলেই তাঁদের এই প্রিয় অধ্যাপকের শিক্ষাদান পদ্ধতির সুখ্যাতি করেছেন। পাঠ্যপুস্তক আলোচনার সূত্র ধরে তিনি সাধারণত সমগ্র বিষয়টিতে ছাত্রদের আকৃষ্ট ও আগ্রহী করে তুলতেন। এই নূতন পদ্ধতিতে অভ্যস্ত হওয়ায় তাঁর ছাত্রদের কাছে পাঠ্যবিষয় কখনও একঘেয়ে মনে হত না আর এইভাবেই তাঁর ছাত্রদের মানসিক ভিত্তি সুদৃঢ়ভাবে গড়ে উঠত। বহু বিষয়ে হরিনাথের আন্তরিক অনুরাগ তাঁর ছাত্রদের স্বাভাবিকভাবেই অনুপ্রাণিত করেছিল। সর্বোপরি এই সহৃদয় অধ্যাপক তাঁর ছাত্রদের সহযোগিতায় সদাসর্বদা প্রস্তুত ছিলেন। ঢাকা কলেজে সংস্কৃতে এম. এ. পড়ার সময় রাধাগোবিন্দ বসাক মহাশয় বাধ্য হয়েই কলকাতায় তাঁর এই প্রাক্তন অধ্যাপকের কাছে আসেন। কেননা ঢাকা কলেজে সে সময় অশোকের অনুশাসন পড়ানোর কোনো ব্যবস্থা ছিল না। হরিনাথ সহজেই তাঁর এই ছাত্রকে অশোকের সময়ের ব্রাহ্মীলিপি শিখিয়ে দেন।

এই সময় হরিনাথ ছাত্রদের সুবিধার জন্য ইংরেজী সাহিত্যের আরও কয়েকটি পাঠ্য-পুস্তকের নূতন সংস্করণ প্রকাশনায় উৎসাহী হন। 1906 খ্রীস্টাব্দে তিনি *Macaulay's Life of Goldsmith* সম্পাদনা করেন। অলিভার গোল্ডস্মিথ (Oliver Goldsmith) ছিলেন বিখ্যাত লেখক। উপন্যাস, কবিতা, নাটক সবই তিনি লিখেছেন। আর তাঁর জীবনও ছিল বিস্ময়কর। সুতরাং তাঁর জীবন সম্বন্ধে মেকলের এই আলোচনায় নানা বিষয়ের অবতারণা স্বাভাবিক। ইতিপূর্বেই বলা হয়েছে যে মেকলের লেখা সাধারণত সহজ ও সরল নয়। আর বিশেষত তা ভারতীয় ছাত্রদের পক্ষে সঠিকভাবে বোঝা খুবই কষ্টকর। মেকলের এই লেখা সম্পাদনা করে হরিনাথ তাই ছাত্রদের যথেষ্ট উপকার করেছেন। এই একই বছরে হরিনাথের *Notes on Webb's Selections from Wordsworth*, Part I প্রকাশিত হয়। কবি উইলিয়ম্ ওয়ার্ডসওয়ার্থ (Willi m Wordsworth)-এর কবিতার এই নির্বাচিত সংকলনটি কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের এফ. এ. পরীক্ষার্থীদের জন্য নির্দিষ্ট হয়েছিল। বলা বাহুল্য, হরিনাথ সম্পাদিত এই

গ্রন্থটিও ছাত্র ও উৎসুক পাঠকসমাজে বেশ জনপ্রিয়তা লাভ করেছিল।

আর শুধুমাত্র ছাত্রদের শিক্ষায় সাধ্যমত সাহায্য করাই নয়, হরিনাথ ইতিমধ্যে বহু দায়িত্বপূর্ণ কাজে যুক্ত হয়েছিলেন। প্রেসিডেন্সি কলেজে অধ্যাপনা করার সময় তিনি কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ফেলো নির্বাচিত হন (1905)। এছাড়া এই বছর থেকে তিনি বিশ্ববিদ্যালয়ের ইংরেজী, গ্রীক, লাতিন, ফরাসী, জার্মান, সংস্কৃত ও সংস্কৃতজ ভাষাসমূহ, আরবী, পারাসীক ও উর্দু বিদ্যাপর্ষদের সদস্য ছিলেন। অল্পকাল পরে উল্লিখিত বিভিন্ন বিদ্যাপর্ষদের মধ্যে আর্মানীয় ও হিব্রু ভাষা ও সাহিত্য যুক্ত হলে হরিনাথ এই দুটি বিষয়েরও সদস্য হলেন (1906-1907 । এ যথার্থই এক দুর্লভ দৃষ্টান্ত। প্রায় এই সময়ে প্রকাশিত হাতে-লেখা প্রেসিডেন্সি কলেজ পত্রিকায় (1905) তিনি ধারাবাহিকভাবে কালিদাসের 'অভিজ্ঞান-শকুন্তলম্' নাটকের ছন্দোবদ্ধ অনুবাদ শুরু করেন। একথা জানা যায় এই কলেজের প্রাক্তন ছাত্র ভারতের প্রথম রাষ্ট্রপতি রাজেন্দ্র প্রসাদের স্মৃতিকথায়। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে ইতিপূর্বে ঢাকা কলেজে অধ্যাপনা করার সময়ে হরিনাথ আরবী, পারসীক ও বাংলা ভাষা থেকে কিছু গদ্য ও পদ্যাংশের ইংরেজী অনুবাদ প্রকাশ করেছিলেন। আর এইসব নানা গুরুত্বপূর্ণ কাজে হরিনাথের যুক্ত থাকার দৃষ্টান্ত স্বাভাবিকভাবেই তাঁর ছাত্রদের অনুপ্রাণিত করেছিল। শুধুমাত্র ছাত্রদের নয়, সহকর্মী ও তরুণ অধ্যাপকদেরও বিদ্যাচর্চায় তিনি সাগ্রহে সহযোগিতা করেছেন। একটি ঘটনা। ইংরেজী সাহিত্যের বিখ্যাত অধ্যাপক প্রফুল্লচন্দ্র ঘোষ তখন কলকাতার রিপন কলেজে পড়ান। একদিন কোনো বইয়ে তিনি একটি লাতিন কবিতার উদ্ধৃতি পান। লাতিন ভাষা তিনি জানতেন। কিন্তু অনেক চেষ্টা করেও তিনি এই জটিল লাতিন কবিতাটির সঠিক অর্থ বুঝতে পারলেন না। তখন তিনি বাধ্য হয়েই হরিনাথের খোঁজে প্রেসিডেন্সি কলেজে চলে এলেন। প্রফুল্লচন্দ্র যখন ঠিক অধ্যাপকদের ঘরে এসে পৌঁছেছেন, হরিনাথ সে সময়ে ক্লাস নিতে যাচ্ছেন। প্রফুল্লচন্দ্রকে তিনি খুব স্নেহ করতেন। তাঁর কাছে আসার কারণ জেনে হরিনাথ বললেন: 'আমার তো এখন দাঁড়ানোর সময় নেই। তুমি বরং এক কাজ কর। ঐখানে ঐ মনোমোহন ঘোষ বসে আছেন; ওঁর এখন ক্লাস নেই। তুমি ওঁকে লাতিন কবিতার উদ্ধৃতিটি দেখাও।' এই বলে হরিনাথ ক্লাসে চলে গেলেন। মনোমোহন অক্সফোর্ডের ক্রাইস্ট কলেজের ছাত্র ছিলেন। লাতিন ও গ্রীক ভাষা তিনি জানতেন। কিন্তু তিনি প্রায় এক ঘণ্টা চেষ্টা করেও এই লাতিন কবিতার অর্থ করতে পারলেন না। এমন কি তিনি কবির নামও বলতে পারলেন না। ইতিমধ্যে ঘণ্টা বেজে গেল; মনোমোহন ক্লাসে যাওয়ার জন্য উঠলেন। হরিনাথ তাঁর ক্লাস থেকে ফিরে এলেন। প্রফুল্লচন্দ্রকে দেখে তিনি জানতে চাইলেন তাঁর কাজ মিটেছে কিনা। তারপর ব্যাপারটা শুনে তিনি প্রফুল্লচন্দ্রকে নিয়ে নিজের ঘরে গেলেন। ঘরে ঢুকেই তিনি লাতিন কবিতার উদ্ধৃতিটি দেখতে চাইলেন। আর

উদ্ধৃতিটি দেখা মাত্রই তিনি কবির নাম বলে দিলেন। শুধু তাই নয়; তিনি এই জটিল লাতিন কবিতার মুখে মুখেই ছন্দোবদ্ধ ইংরেজী অনুবাদ বলে চললেন। তিনি এই অনুবাদ এত তাড়াতাড়ি বলতে শুরু করলেন যে প্রফুল্লচন্দ্রকে বাধ্য হয়ে বলতে হল, 'স্যার, একটু আস্তে বলুন'।

প্রেসিডেন্সি কলেজের বিখ্যাত অধ্যাপকেরা সকলেই হরিনাথের গুণমুগ্ধ ছিলেন। এই কলেজের ছাত্র হিসাবে তিনি এক সময় হ্যারিংটন্ হিউ মেল্‌ভিল্ প্যাসিভ্যাল্ (Harrington Hugh Melville Percival)-এর কাছে পড়েছিলেন। পরবর্তীকালে এই বিখ্যাত অধ্যাপক তাঁর এই প্রতিভাবান্ ছাত্র ও সহকর্মীর প্রশংসায় পঞ্চমুখ হন। লাতিন ও গ্রীক ভাষায় হরিনাথের পাণ্ডিত্য এই প্রবীণ অধ্যাপককে মুগ্ধ করেছিল। আর তাই তিনি তাঁর ক্লাসের ছাত্রদেরও স্বচ্ছন্দে বলতেন, হরিনাথের কাছে তিনি এই দুই প্রাচীন ভাষা বিষয়ে শিক্ষালাভ করতে পারেন। মনোমোহন ঘোষ, সতীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণ, মির্জা আশরফ আলি, হেন্‌রি আর্নেস্ট স্টেপ্‌ল্‌টন্ (Henry Ernest Stapleton), এরনেস্ট ফ্রেডেন্‌বুর্গ (Ernest Vredenburg) প্রমুখ সহকর্মী ও বন্ধুরা সকলে হরিনাথ সম্পর্কে আজীবন শ্রদ্ধাবান্ ছিলেন।

প্রেসিডেন্সি কলেজে অধ্যাপনা করার সময় হরিনাথ কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ কাজের সঙ্গে যুক্ত হন। 1906 খ্রীস্টাব্দের 4 এপ্রিল বিশ্ববিদ্যালয়ের সেনেটের এক অধিবেশন হয়। এই অধিবেশনে হরিনাথ ভাষাতত্ত্বের পাঠ্যসূচীতে কিছু পরিবর্তনের প্রস্তাব করেন। এই প্রস্তাবটি সমর্থন করেছিলেন অধ্যাপক প্যার্সিভ্যাল্। ভোটে তাঁদের প্রস্তাবটি গৃহীত হয়। হরিনাথ তারপর প্রস্তাব করেন গ্রীক সাহিত্যের পাঠ্যসূচীতে কিছু পরিবর্তনের। কলকাতার ইম্‌পিরিয়াল লাইব্রেরির গ্রন্থাগারিক জন্ ম্যাক্‌ফারলেন্ (John Macfarlane) এই প্রস্তাব সমর্থন করেন। হরিনাথের এই প্রস্তাবটি বেশী ভোটে গৃহীত হয়। পরের দিন সেনেটের আর এক অধিবেশন হয়েছিল। এই দিনের আলোচনার বিষয় ছিল ইতিহাসের পাঠ্যসূচী। হরিনাথের সমর্থনে এ সম্পর্কেও কিছু প্রস্তাব গৃহীত হয়। 1906 খ্রীস্টাব্দের 10 এপ্রিল বিশ্ববিদ্যালয়ের সেনেটের পরবর্তী অধিবেশন বসেছিল। এই অধিবেশনে হরিনাথ এম. এ. পরীক্ষার বিষয় সম্পর্কে আলোচনা করেন। প্রথমে তিনি এম. এ. পরীক্ষার বিষয়গুলির মধ্যে ফরাসী ও জার্মান ভাষা যুক্ত করার প্রস্তাব করলেন। তাঁর এই প্রস্তাব সমর্থন করেন ভূপেন্দ্রনাথ বসু। হরিনাথের দ্বিতীয় প্রস্তাবটিও ছিল মূল্যবান্। তিনি প্রস্তাব করলেন, সংস্কৃত 'এফ্' গ্রুপের এম্. এ. পরীক্ষায় দুটি বিষয় যুক্ত করার। এই দুটি বিষয় হল—(ক) প্রাচীন ভারতের ইতিহাস ও ভূগোল এবং (খ) অশোক ও তাঁর পরবর্তী সময়ের শিলালিপি। হরিনাথের এই প্রস্তাবও অধিবেশনে গৃহীত হয়।

1906 খ্রীস্টাব্দের এপ্রিল মাসে হরিনাথ দ্বিতীয়বার ইওরোপে যান। আর এই সময়

তিনি বিখ্যাত সব পণ্ডিতের সঙ্গে প্রাচ্যবিদ্যা সম্পর্কে যথেষ্ট আলোচনা করেন। হরিনাথের সঙ্গে বৌদ্ধ ধর্ম ও সাহিত্যের আলোচনায় টমাস্ উইলিয়ম্ রীস্ ডেভিডস্ খুব খুশী হন। ইওরোপীয় বিদ্যায় পারদর্শী একজন তরুণ ভারতীয়ের বৌদ্ধশাস্ত্রে বিপুল জ্ঞানে ইংল্যান্ডের এই প্রবীণ পণ্ডিত মুগ্ধ হলেন। শুধু তাই নয়, হরিনাথ এই সময় বৌদ্ধধর্ম ও সাহিত্য সম্পর্কে কয়েকটি টীকা লেখেন। তাঁর এই টীকাগুলি খুব মূল্যবান্। অবিলম্বে লন্ডন্ থেকে প্রকাশিত বৌদ্ধচর্চার বিখ্যাত পত্রিকায় তাঁর এই টীকাগুলি ছাপা হয়। এ বিষয়ে অষ্টম অধ্যায়ে আলোচনা করা যাবে। হরিনাথ এই সময় রিখার্ট ফন্ পিশেলের সঙ্গেও নানা বিষয়ে আলোচনা করেন। জার্মানীর এই সুবিখ্যাত পণ্ডিত প্রাচ্যবিদ্যায় পারদর্শী ছিলেন। প্রাকৃত, পালি, সংস্কৃত প্রভৃতি ভাষায় তাঁর অসাধারণ অধিকার ছিল। তাঁর সঙ্গে হরিনাথের আলোচনার অন্যতম বিষয় ছিল কালিদাসের 'অভিজ্ঞান-শকুন্তলম্' নাটক। তাঁরা দুজনে এই সংস্কৃত নাটকের মূলপাঠ ও অনুবাদ সমস্যা নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করেন। এই আলোচনার সূত্রে প্রাকৃত ভাষায় হরিনাথের আগ্রহে ও দক্ষতায় জার্মানীর প্রখ্যাত পণ্ডিত মুগ্ধ হন। তাই পিশেল এই সময় তাঁর 'প্রাকৃত ভাষার ব্যাকরণ' গ্রন্থটি ইংরেজীতে অনুবাদ করার জন্য হরিনাথকে অনুরোধ করেন। বলা বাহুল্য, এই প্রকাণ্ড গ্রন্থ জার্মান ভাষায় লেখা এবং আজও তা খুব মূল্যবান্। এইভাবে ইওরোপের প্রধান সব পণ্ডিতদের কাছ থেকে একজন ভারতীয় যুবক বিস্তর প্রশংসা ও উৎসাহ পেলেন। স্বদেশে ফেরার পথে হরিনাথ পুনরায় ইতালী ভ্রমণে যান। ইতিপূর্বে কেমব্রিজে ছাত্রাবস্থায় (1898) তিনি ব্যাপকভাবে ইতালী এবং ফ্রান্সে ভ্রমণ করেন। 1906 খ্রীস্টাব্দের 9 মে তিনি রোম শহরে এক হোটেলে তাঁর বিশিষ্ট বন্ধু বর্ধমানের মহারাজা বিজয় চন্দ্‌ মহ্‌তাবের সঙ্গে মিলিত হন। তারপর তিনি মহারাজার ইওরোপ ভ্রমণের সঙ্গী হলেন।

1906 খ্রীস্টাব্দের জুলাই মাসে হরিনাথ ইওরোপ থেকে কলকাতায় ফেরেন এবং এই বছরের 4 নভেম্বর তিনি হুগলি কলেজের অস্থায়ী অধ্যক্ষের পদে নিযুক্ত হন। এই সময় তিনি কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন দায়িত্বপূর্ণ কাজের সঙ্গেও ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত ছিলেন। আর নানা বিষয়ে গবেষণা ছাড়া তিনি এ সময়ে অমৃতলাল বসুর 'রাজা বাহাদুর' ও গিরিশচন্দ্র ঘোষের 'সিরাজদ্দৌলা' নাটকের ইংরেজী অনুবাদে মনোনিবেশ করেন।

এই বছরের 5 ডিসেম্বর কলকাতার ইম্পিরিয়াল লাইব্রেরির গ্রন্থাগারিক জন্ ম্যাক্ফারলেন্ মারা যান। এই গ্রন্থাগারিকের পদের জন্য লেখা হরিনাথের আবেদন-পত্র থেকে জানা যায় যে ইতিমধ্যে তিনি বহু বিষয়ে শিক্ষাদানে কৃতিত্ব দেখিয়েছেন। এই বিষয়গুলি হল যথাক্রমে ইংরেজী, লাতিন, গ্রীক, ফরাসী, পালি, তুলনামূলক ভাষাতত্ত্ব, অ্যাংলো-স্যাকশন্ ভাষা ও ইতিহাস। আর শুধুমাত্র সুষ্ঠু শিক্ষাদানই নয়,

পূর্বেই বলা হয়েছে যে তিনি এই সময় কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন দায়িত্বপূর্ণ কাজের সঙ্গেও সমানে যুক্ত ছিলেন। 1906 খ্রীস্টাব্দের 15 ডিসেম্বর বিশ্ববিদ্যালয়ের সেনেটের অধিবেশনটি ছিল গুরুত্বপূর্ণ। সিন্‌ডিকেটের চারজন প্রতিনিধি নির্বাচনের জন্য এই অধিবেশন বসেছিল। বারজন বিশিষ্ট ভারতীয় ও ইওরোপীয় শিক্ষাব্রতী এই নির্বাচনে প্রতিযোগিতা করেন। ভোটে জয়লাভ করে হরিনাথ সিন্‌ডিকেটের সদস্য হন। জি. এফ্. এ. হ্যারিস্ (G. F. A. Harris), কালীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় ও ভূপেন্দ্রনাথ বসুও এই নির্বাচনে জয়ী হলেন। এই সময় বিশ্ববিদ্যালয়ের রেজিস্ট্রার সিন্‌ডিকেটের সদস্যদের কাছে একটি প্রস্তাব বিবেচনার জন্য পেশ করেন। প্রস্তাবটি ছিল একখানি আরবী ব্যাকরণ রচনার। ম্যাট্রিকুলেশ‌ন্ ও ইন্‌ট্যারমিডিয়েট পরীক্ষার্থীদের পাঠ্যপুস্তক হিসাবে এই আরবী ব্যাকরণ নির্দিষ্ট হয়েছিল। সিন্‌ডিকেটের পরের অধিবেশনে (22 ডিসেম্বর 1906) এই ব্যাকরণ রচনার ভার আর্. এফ্. আজু এবং হরিনাথের ওপর দেওয়া হয়। এ বিষয়ে স্থির হয় যে এই কাজের জন্য তাঁরা যথাক্রমে দু হাজার ও এক হাজার টাকা পারিশ্রমিক হিসাবে লাভ করবেন। কিন্তু শেষপর্যন্ত এই আরবী ব্যাকরণ রচনার কাজ হরিনাথ একাই সম্পন্ন করেন। 1907 খ্রীস্টাব্দের 23 ফেব্রুয়ারি তিনি কলকাতার ইম্‌পিরিয়াল লাইব্রেরির গ্রন্থাগারিক নিযুক্ত হন। কিন্তু তা সত্ত্বেও তিনি প্রায় আজীবন এই বিশ্ববিদ্যালয়ের সেবায় ব্রতী ছিলেন।

সিন্‌ডিকেটের উক্ত অধিবেশনে বিশ্ববিদ্যালয়ের লেকচারার নিয়োগের বিষয়ও বিবেচিত হয়। আর সিন্‌ডিকেটের সুপারিশ অনুযায়ী সেনেটের এক অধিবেশনে (27 মে 1907) হরিনাথ তুলনামূলক ভাষাতত্ত্বের লেকচারার নিযুক্ত হন। সেনেটের এই অধিবেশনে অন্যান্য বিষয়ে আরও তেইশজন শিক্ষাব্রতী লেকচারারের পদলাভ করেন। ইতিমধ্যে হরিনাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের আরও অনেক গুরুত্বপূর্ণ কাজে নিজেকে নিয়োজিত করেছিলেন। 1907 খ্রীস্টাব্দের 1 ফেব্রুয়ারি সিন্‌ডিকেটের এক অধিবেশন অনুষ্ঠিত হয়। এই অধিবেশনে হরিনাথ বিশ্ববিদ্যালয় থেকে এক পালি ব্যাকরণ প্রকাশনার প্রস্তাব করলেন। তাঁর এই প্রস্তাব অনুসারে পালি ভাষার বিখ্যাত ব্যাকরণ 'বালাবতার' সম্পাদনার ভার ধর্মানন্দ কোসম্বীর হাতে দেওয়া হয়। এ সম্পর্কে আরও স্থির হয় যে ইংরেজী অনুবাদ ও টীকাসহ ধর্মকীর্তির ব্যাকরণ গ্রন্থটি রোমান অক্ষরে সম্পাদিত হবে। আর তিনজন সদস্যের একটি ছোট কমিটি এই কাজ তত্ত্বাবধান করবেন। এই কমিটিতে হরিনাথ ছাড়া অন্য দুজন সদস্য ছিলেন। তাঁরা হলেন কলকাতার মহামান্য লর্ড বিশপ এবং বিখ্যাত পণ্ডিত সতীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণ। 1907 খ্রীস্টাব্দের 16 মার্চ বিশ্ববিদ্যালয়ের সিন্‌ডিকেটের পরের অধিবেশন বসেছিল। এই অধিবেশনে প্রেমচাঁদ রায়চাঁদ ছাত্রবৃত্তি পরীক্ষার বিষয়গুলি আলোচিত হয়। আর এই পরীক্ষার বিষয়গুলির মানের সমতা রক্ষার জন্য একটি কমিটি গঠিত হয়েছিল। এই কমিটির সাতজন সদস্যের মধ্যে হরিনাথ

ছিলেন অন্যতম। সিন্‌ডিকেটের পরবর্তী অধিবেশনে (11 মে 1907) কলকাতার সেন্ট্‌ জেভিয়ার্স কলেজে ইংরেজীতে এম্‌. এ. পর্যন্ত পড়ানোর বিষয় আলোচিত হয়। এ সম্পর্কে সঠিক রিপোর্টের জন্য সিন্‌ডিকেট হরিনাথ ও হেরম্বচন্দ্র মৈত্রকে উক্ত কলেজ পরিদর্শনের অনুরোধ জানান। 1907 খ্রীস্টাব্দের 24 জুলাই সিন্‌ডিকেটের অধিবেশনে বিশ্ববিদ্যালয়ের আরবী ও পারসীক পাঠ-সংকলনগুলির মুদ্রণের বিষয় আলোচিত হয়। বলা বাহুল্য, এইসব পাঠ-সংকলন বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন পরীক্ষার জন্য নির্দিষ্ট ছিল। হরিনাথের সঙ্গে পরামর্শের পর এ বিষয়ে রেজিস্ট্রার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। সর্বোপরি এই বছরেও হরিনাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের এনট্রনস্‌ (লাতিন, গ্রীক ও পালি), এফ্‌. এ. (লাতিন, পালি ও আরবী), বি. এ. (লাতিন ও আরবী) এবং এম্‌. এ. (লাতিন ও আরবী) পরীক্ষার প্রশ্নকর্তা ও পরীক্ষক ছিলেন। পূর্বেই বলা হয়েছে যে এই বছরই বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রথম তুলনামূলক ভাষাতত্ত্বের প্রেমচাঁদ রায়চাঁদ ছাত্রবৃত্তি পরীক্ষা গ্রহণ করা হয়েছিল। এই পরীক্ষার প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় পত্রের প্রশ্নকর্তা ও পরীক্ষক ছিলেন হরিনাথ এবং চতুর্থ পত্রের হরপ্রসাদ শাস্ত্রী। পরীক্ষার্থী ছিলেন কলকাতার প্রেসিডেন্সি কলেজের বিখ্যাত অধ্যাপক প্রফুল্লচন্দ্র ঘোষ।

1908 খ্রীস্টাব্দের 13 জুন সেনেটের অধিবেশন অনুষ্ঠিত হয়। এই অধিবেশনে সিন্‌ডিকেটের সুপারিশ অনুসারে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের রীডারের পদে রিখার্ট ফন্‌ পিশেলের নিয়োগের বিষয় আলোচিত হয়েছিল। প্রাকৃত ভাষা ও সাহিত্যে সুপণ্ডিত পিশেলের এই নিয়োগ খুবই গুরুত্বপূর্ণ। কেননা ইতিপূর্বে এদেশের আর কোনো বিশ্ববিদ্যালয়েই প্রাকৃত ভাষাতত্ত্ব সম্পর্কে উৎসাহ ও আগ্রহ দেখা যায়নি। যদিও আধুনিক ভারতীয় ভাষাগুলির আলোচনায় প্রাকৃত ভাষার ভূমিকা অত্যন্ত মূল্যবান্‌। বিখ্যাত পণ্ডিত ব্রজেন্দ্রনাথ শীল এই প্রস্তাবের প্রয়োজনীয়তার কথা আলোচনা করেন। তাঁর মতে অতীতে এদেশে হেমচন্দ্রের মতন মহামতি ব্যাকরণকার জন্মগ্রহণ করেন। কিন্তু সাম্প্রতিককালে প্রাকৃতচর্চায় ভারতীয় পণ্ডিতদের কৃতিত্ব অতি সামান্যই। ব্রজেন্দ্রনাথের বক্তব্যের হরিনাথ খুব প্রশংসা করেন। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাষাতত্ত্বের লেকচারার হিসাবে হরিনাথ এদেশে প্রাকৃতচর্চার অনুসন্ধানে নিজের অভিজ্ঞতার কথা অত্যন্ত দুঃখের সঙ্গে জানান। তাঁর মতে এইসব লেখার বেশীর-ভাগই আদৌ প্রশংসার যোগ্য নয়। প্রসঙ্গক্রমে তিনি স্পষ্টতই বলেন যে বিজ্ঞান-সম্মত পদ্ধতিতে প্রাকৃতচর্চা ভারতের ভাষাসমূহের উৎপত্তি ও ইতিহাস জানার ক্ষেত্রে খুবই মূল্যবান্‌। তারপর হরিনাথ জার্মানীর এই পণ্ডিতের অপরিসীম প্রশংসা করেন। তাঁর মতে এই পণ্ডিত শুধুমাত্র প্রাকৃত ভাষাচর্চার ক্ষেত্রেই যোগ্যতম ব্যক্তি নন, সংস্কৃতজ ভাষাসমূহের ব্যাকরণেও তাঁর বিপুল অধিকার। পূর্বেই বলা হয়েছে যে হরিনাথের সঙ্গে জার্মানীর এই বিখ্যাত পণ্ডিতের খুব বন্ধুত্ব ছিল। আর তাঁর

বন্ধুত্বে ও পাণ্ডিত্যে মুগ্ধ হয়েই পিশেল কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের আমন্ত্রণ সাদরে গ্রহণ করেন। এই সময় গিরিশচন্দ্র সেন নামে এক পরীক্ষার্থী বিশ্ববিদ্যালয়ের তুলনামূলক ভাষাতত্ত্বে এম. এ. পরীক্ষা দিতে ইচ্ছুক হন। সিন্ডিকেটের অধিবেশনে (25 জুলাই 1908) এই পরীক্ষা পরিচালনার জন্য চারজন পরীক্ষক নিযুক্ত হলেন। হরিনাথ ছিলেন তাঁদের অন্যতম। তিনি ছাড়া অন্যান্য তিনজন পরীক্ষকই ছিলেন জার্মানীর খ্যাতনামা পণ্ডিত। সিন্ডিকেটের সিদ্ধান্ত অনুসারে এ বিষয়ে হরিনাথের ওপর আরও কিছু দায়িত্ব দেওয়া হয়। উক্ত পরীক্ষার্থীর পাঠ্যপুস্তকের একটি তালিকা নির্মাণের ভারও তাঁর ওপর পড়ে। এছাড়া এ বছরেও হরিনাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের এনট্রন্স্ (গ্রীক ও লাতিন), এফ্. এ (পালি, লাতিন ও আরবী), বি. এ. (ইংরেজী, গ্রীক, লাতিন, পালি ও আরবী) এবং এম্. এ (লাতিন, ইংরেজী, পালি ও আরবা) পরীক্ষার প্রশ্নকর্তা ও পরীক্ষক ছিলেন।

1909 খ্রীস্টাব্দের 8 জানুয়ারি সিন্ডিকেটের অধিবেশনে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের রেজিস্ট্রার রিখার্ট ফন্ পিশেলের মৃত্যুর সংবাদ জানান। ইতিপূর্বেই বলা হয়েছে যে এই বিশ্ববিদ্যালয়ের রীডার নিযুক্ত হয়ে বার্লিন থেকে কলকাতায় আসার সময় তিনি হঠাৎ কলেরা রোগে আক্রান্ত হন। এই দুঃসংবাদ পেয়েই হরিনাথ মাদ্রাজে যান। কিন্তু অনেক চেষ্টা করেও তিনি শেষ পর্যন্ত তাঁর এই শ্রদ্ধেয় বন্ধুকে বাঁচাতে পারলেন না। মৃত্যুর আগে পিশেল প্রকাশের জন্য তাঁর প্রায় সম্পূর্ণ একটি গ্রন্থের পাণ্ডুলিপি হরিনাথের হাতে দিয়ে যান। প্রাকৃত ভাষাতত্ত্ব সম্বন্ধে তাঁর ভাষণগুলি এই অপ্রকাশিত গ্রন্থের বিষয় ছিল। সিন্ডিকেটের উক্ত অধিবেশনে এ সম্পর্কে এক সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়। পিশেলের এই অপ্রকাশিত গ্রন্থের সম্পাদনা ও মুদ্রণের কাজ তত্ত্বাবধানের জন্য তিনজন বিশেষজ্ঞ নিযুক্ত হন। হরিনাথ ছাড়া অপর দুজন হলেন জর্জ তিবো এবং এরনস্ট টেওডোর্ ব্লখ্। সিন্ডিকেটের পরবর্তী অধিবেশনে (22 জানুয়ারি 1909) বিশ্ববিদ্যালয়ের পালি ভাষা ও সাহিত্যের লেকচারারের পদ পূরণের জন্য একটি কমিটি গঠিত হয়। কেননা ধর্মানন্দ কোসম্বী এই সময় লেকচারারের পদে ইস্তফা দেন। এই তিনজন বিশেষজ্ঞের কমিটিতেও অন্যতম সদস্য হিসাবে হরিনাথ যুক্ত ছিলেন। সিন্ডিকেটের পরের অধিবেশনে (5 মার্চ 1909) আরবী ও সংস্কৃত ভাষায় হাই প্রফিশিয়েন্সি এবং ডিগ্রী অব্ অনার পরীক্ষা পরিচালনার জন্য বারজন বিশিষ্ট শিক্ষাব্রতী নির্বাচিত হন। হরিনাথ ছিলেন তাঁদের অন্যতম। সিন্ডিকেটের সিদ্ধান্ত অনুসারে এই ইওরোপীয় ও এশীয় পণ্ডিতদের তালিকায় একমাত্র হরিনাথই ছিলেন দুটি ভাষার পরীক্ষা পরিচালনার ক্ষেত্রে যোগ্যতার অধিকারী। পূর্বেই বলা হয়েছে যে ভারত সরকার প্রবর্তিত এই পরীক্ষাগুলির প্রায় সবই তিনি সসম্মানে উত্তীর্ণ হন এবং বেশ কয়েক হাজার টাকা পুরস্কার পান। 1909 খ্রীস্টাব্দের 1 মে সিন্ডিকেটের

পরবর্তী অধিবেশন অনুষ্ঠিত হয়। এই অধিবেশনে হরিনাথ আরও দু বছরের জন্য তুলনা-মূলক ভাষাতত্ত্বের লেকচারার নিযুক্ত হলেন। অন্যান্যদের মধ্যে তাঁর অন্তরঙ্গ বন্ধু আবদুল্লাহ অল্-মামুন সুহ্‌রাবর্দি এই সময় আরবী ভাষা ও সাহিত্যের লেকচারার নিযুক্ত হন। তিনি ছিলেন এই বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম পি. এইচ্. ডি. (1908)। একই বছরে সতীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণও এই উপাধিলাভ করেছিলেন। তাঁর সঙ্গেও হরিনাথের খুব বন্ধুত্ব ছিল। সিন্‌ডিকেটের পরের অধিবেশনে (10 জুলাই 1909) বিশ্ববিদ্যালয়ের অন্তর্ভুক্ত কলেজগুলি পরিদর্শনের ভার হরিনাথ এবং পাউল্ ইওহানেস্ ব্রুএল্ (Paul Johannes Bruehl -এর ওপর দেওয়া হয়। সিন্‌ডিকেটের পরবর্তী অধিবেশনে (24 জুলাই 1909) হরিনাথ তাঁর দেওয়া তুলনামূলক ভাষাতত্ত্ব বিষয়ক বক্তৃতাগুলির সংক্ষিপ্তসার প্রকাশনার অধিকার পেলেন। আর এই বক্তৃতাগুলির মুদ্রণের ব্যাপারে তাঁকে বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রেস ব্যবহারের নির্দেশও দেওয়া হয়। সিন্‌ডিকেটের পরের অধিবেশনে (14 আগস্ট 1909) শামসুল-উলমা আহ্‌মদ আরবীতে এম্. এ. পরীক্ষার পাঠ্যাংশের একটি তালিকা পেশ করেন। এই কাজটি তাঁর এবং হরিনাথের যুগ্ম চেষ্টাতেই সম্পন্ন হয়। সর্বোপরি এ বছরেও হরিনাথ বিশ্ব-বিদ্যালয়ের এনট্রেন্স (গ্রীক, লাতিন ও পালি), আই. এ. (লাতিন, পালি ও আরবী), বি. এ. (ইংরেজী, লাতিন ও পালি) এবং এম্. এ. (ইংরেজী ও আরবী) পরীক্ষার প্রশ্নকর্তা ও পরীক্ষক নিযুক্ত হন। আর অন্যান্য বছরের মতন এবারেও তিনি ইংরেজী, গ্রীক, লাতিন, ফরাসী, জার্মান, আর্মানীয়, সংস্কৃত, সংস্কৃতজ ভাষাসমূহ, পারসীক, উর্দু ও আরবী বিদ্যাপর্ষদের সদস্য ছিলেন।

1910 খ্রীস্টাব্দের 2 জানুয়ারি সিন্‌ডিকেটের পরবর্তী অধিবেশন অনুষ্ঠিত হয়। এই অধিবেশনে হরিনাথ জানান যে ম্যাট্রিকুলেশ্‌ন্ পরীক্ষার সংস্কৃত পাঠ্যাংশের শব্দ সংকলনের কাজ তিনি সম্পন্ন করেছেন। সিন্‌ডিকেটের পরের অধিবেশনে (3 সেপ্টেম্বর 1910) তিনি আরবী ব্যাকরণের পাণ্ডুলিপিটি পেশ করেন। এই ব্যাকরণটি ইংরেজী ভাষায় লেখা। আর এ কাজে তাঁর সহযোগী ছিলেন আর্. এফ. আজু। সিন্‌ডিকেটের সিদ্ধান্ত অনুসারে এ সম্পর্কে অভিমত সংগ্রহের জন্য পাণ্ডুলিপিটি ই. ডেনিসন রস্ (E. Denison Ross)-এর কাছে পাঠাবার কথা ছিল। সিন্‌ডিকেটের পরবর্তী অধিবেশনের (3 ডিসেম্বর 1910) আলোচনা থেকে জানা যায় যে উক্ত আরবী ব্যাকরণের সমগ্র পাণ্ডুলিপিটি আসলে হরিনাথেরই লেখা। গ্রন্থরচনা ছাড়া তিনি এ বছরেও বিশ্ববিদ্যালয়ের ম্যাট্রিকুলেশ্‌ন্ (গ্রীক, লাতিন, ফরাসী ও পালি), আই. এ. (লাতিন, ফরাসী ও পালি), এবং বি. এ. (লাতিন, সংস্কৃত ও পালি) পরীক্ষার প্রশ্নকর্তা ও পরীক্ষক নিযুক্ত হন।

এইভাবে হরিনাথ কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধিকাংশ কাজের সঙ্গে আজীবন ঘনিষ্ঠ-

ভাবে যুক্ত ছিলেন। বলা বাহুল্য, ইতিমধ্যে তিনি ইম্‌পিরিয়াল লাইব্রেরির গ্রন্থাগারিক নিযুক্ত হন। আর এই সময় তাঁর নিজের বিদ্যাচর্চা ও গবেষণাও সমানে অব্যাহত ছিল। কিন্তু এইসব বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ কাজের সঙ্গে যুক্ত থেকেও হরিনাথের মতন একযোগে বিশ্ববিদ্যালয়ের সেবায় ব্রতী হওয়ার দৃষ্টান্ত যথার্থই বিরল। এই বিস্ময়কর নজীর শুধুমাত্র এ দেশেই নয়, সর্বদেশের ও সর্বকালের অধ্যাপনার ইতিহাসেই একান্ত দুর্লভ।

ইম্‌পিরিয়াল লাইব্রেরির গ্রন্থাগারিক

কলকাতার এশিয়াটিক সোসাইটির সঙ্গে উইলিয়ম্ জোন্সের সম্পর্ক যেমন অবিচ্ছেদ্য, হরিনাথের সঙ্গে প্রায় তেমনি সম্পর্ক কলকাতার ইম্‌পিরিয়াল (বর্তমানে ন্যাশন্যাল) লাইব্রেরির। ভারত সরকারের বিভিন্ন বিভাগীয় গ্রন্থাগারকে একত্রিত করার ফলেই 1891 খ্রীস্টাব্দে এই লাইব্রেরির সূচনা। পদস্থ সরকারী কর্মচারীরাই প্রধানত তখন এই গ্রন্থাগার ব্যবহার করতে পারতেন। 1902 খ্রীস্টাব্দে ভারতের বড়লাট লর্ড কার্জনের চেষ্টাতেই এই গ্রন্থাগার এবং কলকাতা পাবলিক লাইব্রেরি একত্রিত হয়। 1903 খ্রীস্টাব্দের 30 জানুয়ারি লর্ড কার্জন আনুষ্ঠানিকভাবে ইম্‌পিরিয়াল লাইব্রেরি জনসাধারণের জন্য উন্মুক্ত করেন। এই উপলক্ষে কলকাতার গণ্যমান্য ব্যক্তিরা আমন্ত্রিত হন।

ভারতের এই প্রধান লাইব্রেরির গ্রন্থাগারিক নিযুক্ত হলেন ম্যাকফারলেন্। 1902 খ্রীস্টাব্দে এই পদ লাভের পূর্বে তিনি লন্ডনের ব্রিটিশ মিউজিয়মের (বর্তমানে লাইব্রেরি) সহকারী গ্রন্থাগারিক ছিলেন। তাঁর মৃত্যুর পর হরিনাথ এই পদটি পাওয়ার ইচ্ছায় স্বরাষ্ট্র বিভাগের সচিবের কাছে এক আবেদনপত্র পাঠান (12 ডিসেম্বর 1906)। এই আবেদনপত্রে গ্রন্থাগারিক পদলাভের পক্ষে তাঁর যোগ্যতার যথেষ্ট পরিচয় পাওয়া যায়। সাহিত্য, ইতিহাস, ভাষাতত্ত্ব প্রভৃতি বিষয়ক গ্রন্থ সম্পর্কে তাঁর অপরিসীম জ্ঞান ছিল। পুস্তক-নির্বাচনের ক্ষেত্রে ইতিপূর্বে এই লাইব্রেরির প্রথম গ্রন্থাগারিক তাঁর সহায়তা গ্রহণ করতেন। আর ব্রিটিশ মিউজিয়ম ইন্ডিয়া অফিস লাইব্রেরি, কেমব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগার ক্রাইস্ট'স্ কলেজের অধ্যাপক রবার্টসন্ স্মিথ্‌স্ ওরিয়েন্টল লাইব্রেরি, ফ্রান্সের জাতীয় গ্রন্থাগার প্রভৃতি ইওরোপের বিভিন্ন গ্রন্থপীঠে হরিনাথ নিজেও গবেষণার কাজ করেছেন। এছাড়া এশিয়া ও ইওরোপের খ্যাতনামা সব পণ্ডিতের সঙ্গে বিদ্যাচর্চার নানা বিষয়ে তাঁর সমানে পত্রবিনিময় ছিল। প্রসঙ্গত বলা যায় যে হরিনাথ তাঁর উল্লিখিত আবেদনপত্রের সঙ্গে সিরিয়া থেকে তাঁকে লাতিন ভাষায় লেখা এক চিঠি যুক্ত করেন। সর্বোপরি দেশবিদেশের পণ্ডিতসমাজের সঙ্গে তাঁর ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ ছিল।

কেমব্রিজে ছাত্রজীবন শেষ করার পূর্বে হরিনাথ লন্ডনের রয়াল এশিয়াটিক সোসাইটির সদস্য নির্বাচিত হন (1901)। কলকাতার এশিয়াটিক সোসাইটির সঙ্গেও তাঁর সম্পর্ক বরাবর ঘনিষ্ঠ ছিল। ঢাকা কলেজে অধ্যাপনা করার সময় তিনি এই

সোসাইটির সদস্যপদ লাভ করেন (3 জুন 1903)। তারপর কলকাতার প্রেসিডেন্সি কলেজে যোগদান করার পর থেকেই তিনি এই সোসাইটির বিভিন্ন দায়িত্বপূর্ণ কাজের সঙ্গে যুক্ত হতে থাকেন। 1905 খ্রীস্টাব্দের 5 এপ্রিল তিনি এই সোসাইটির লাইব্রেরি এবং ভাষাতত্ত্ব বিষয়ক কমিটির সদস্য নির্বাচিত হন। এই সময় উক্ত সোসাইটির গ্রন্থাগারের পুস্তক-তালিকার নূতন সংস্করণ প্রকাশনার ভার হরিনাথের ওপর দেওয়া হয়। 1906 খ্রীস্টাব্দের 7 ফেব্রুয়ারি তিনি এই সোসাইটির কাউন্সিলের সদস্য নির্বাচিত হন। এই কাউন্সিলের দশজন সদস্যের মধ্যে মাত্র দুজন ছিলেন ভারতীয়। হরিনাথ ছাড়া অন্যজন হলেন সতীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণ। এই বছর হরিনাথ কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের লাইব্রেরি কমিটি এবং লাইব্রেরি কার্যনির্বাহী কমিটির সদস্যপদও লাভ করেন। ইতিমধ্যে হরিনাথ কলকাতার মুসলিম ইন্স্টিটিউটের সম্মানিত সদস্য নির্বাচিত হন। তিনি ছাড়া এই সম্মানিত পদের অধিকারী তিনজনই ছিলেন ইওরোপীয়। 1906 খ্রীস্টাব্দ থেকে তিনি জার্মান প্রাচ্যবিদ্যা সমিতির সভ্য ছিলেন। 1907 খ্রীস্টাব্দের 27 এপ্রিল আনুষ্ঠানিকভাবে কলকাতা হিস্টরিক্যল্ সোসাইটির সূচনা। কলকাতার ইতিহাসপ্রসিদ্ধ টাউন হলে এই সোসাইটির উদ্বোধনী সভা অনুষ্ঠিত হয়। এই সভাতেই হরিনাথ উক্ত সোসাইটির কাউন্সিলের সদস্য নির্বাচিত হন। প্রসঙ্গত বলা যায় যে নির্বাচিত মোট ছাব্বিশজন সদস্যের প্রায় সকলেই ছিলেন ইংরেজ। এ ছাড়া হরিনাথ কলকাতার বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের সভ্য এবং বৌদ্ধ-ধর্মাঙ্কুর সভার সম্মানিত সদস্য নির্বাচিত হন।

সর্বোপরি ইম্পিরিয়াল লাইব্রেরির গ্রন্থাগারিক পদলাভের পক্ষে দুটি বিষয়ে হরিনাথের যোগ্যতা বিশেষভাবে সহায়ক হয়। এই দুটি বিষয় হল—এশিয়া ও ইওরোপের বহু-ভাষায় তাঁর বিস্ময়কর দক্ষতা এবং বিভিন্ন বিষয়ের গ্রন্থ সম্পর্কে তাঁর অসাধারণ জ্ঞান।

1907 খ্রীস্টাব্দের 23 ফেব্রুয়ারি হরিনাথ ইম্পিরিয়াল লাইব্রেরির গ্রন্থাগারিক নিযুক্ত হন। এই লাইব্রেরির প্রধান করণিক জে এস্ ডি'সিল্ভা (J. S. D'Silva)-র কাছ থেকেই তিনি কাজের ভার বুঝে নিয়েছিলেন। কেননা জন্ ম্যাক্ফারলেনের অবর্তমানে নয় মাসেরও বেশী সময় এই প্রধান করণিকই গ্রন্থাগারিকের কাজ করেন। হরিনাথের এই পদলাভের সংবাদে ইংল্যান্ড্ থেকে প্রথম গ্রন্থাগারিকের পৃষ্ঠপোষক স্বয়ং লর্ড কার্জন্ তাঁকে এক অভিনন্দনপত্র পাঠান। অন্যান্য বিষয়ের মধ্যে তিনি লিখেছিলেন, "যোগ্য ব্যক্তিই যোগ্য কাজে নিযুক্ত হয়েছেন।" আধুনিক ভারতের ইতিহাসে নানাকারণে কুখ্যাত এই বড়লাট কিন্তু যথার্থই বিদ্যানুরাগী ছিলেন। ভারতের সংস্কৃতি-চর্চার উন্নতি ও প্রসারে তাঁর আগ্রহ ও উৎসাহের কথা উল্লেখ্য।

ইম্পিরিয়াল লাইব্রেরির বার্ষিক রিপোর্টগুলি থেকে গ্রন্থাগারিক হিসাবে হরিনাথের কাজকর্মের যথেষ্ট পরিচয় পাওয়া যায়। গ্রন্থাগারের সুষ্ঠু সংগঠনের ক্ষেত্রে সংগ্রহ ও

সংরক্ষণের কাজ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। আর সংগৃহীত পুস্তকের যথাযথ ব্যবহারের জন্ত তালিকা রচনার কাজও কম মূল্যবান্ নয়। বলা বাহুল্য, প্রথম থেকেই হরিনাথ এইসব বিষয়ে খুব উৎসাহী ছিলেন। সরকারী উদ্যোগে প্রকাশিত গ্রন্থের তালিকা বর্ণানুক্রমে মুদ্রণ করা ছাড়া তিনি বিভিন্ন ইওরোপীয় ভাষায় লেখা পুস্তকের বিষয়সূচী রচনার কাজেও আগ্রহী হন। ভারতের বিভিন্ন ভাষায় লেখা গ্রন্থের তালিকা রচনার কাজও তিনি প্রায় সম্পন্ন করেন। 1907 খ্রীস্টাব্দে সংগৃহীত পুস্তক ও পত্রপত্রিকার পরিমাণ আগের বছরের তুলনায় অনেক বৃদ্ধি পায়। আর এইসব গ্রন্থের স্থায়ী সংরক্ষণের জন্ত হরিনাথ সম্ভাব্য সমস্ত পদ্ধতির সদ্ব্যবহার করেন। ইম্পিরিয়াল লাইব্রেরির সংগ্রহকে উন্নত করার ইচ্ছায় তিনি মূল্যবান পুস্তক কেনার ব্যাপারেও সমানে উৎসাহী ছিলেন। এ বিষয়ে উল্লেখ্য যে 1667 খ্রীস্টাব্দে ভেনিস্ থেকে প্রকাশিত সতের শতকের ভারতবর্ষ সম্পর্কে এক দুষ্প্রাপ্য গ্রন্থ তিনি লাইব্রেরির জন্ত সংগ্রহ করেন। এই গ্রন্থটি হল ইতালীয় ভাষায় লেখা ফিলপ্পো (Filippo)-র 'প্রাচ্য-ভ্রমণ'।

1908 খ্রীস্টাব্দের ডিসেম্বর মাসে হরিনাথ ইম্পিরিয়াল লাইব্রেরির বিষয়ভিত্তিক পুস্তক-তালিকা (দ্বিতীয় ভাগ) প্রকাশ করেন। বর্ণানুক্রমে এই পুস্তক-তালিকার প্রথম খণ্ডের পৃষ্ঠা সংখ্যা হল পাঁচ শ সাতচল্লিশ। 1910 খ্রীস্টাব্দে এই পুস্তক-তালিকার দ্বিতীয় খণ্ড (পৃষ্ঠা সংখ্যা তিন শ পনের) প্রকাশিত হয়। প্রথম খণ্ডে সংযুক্ত হরিনাথের ভূমিকা থেকে জানা যায়, 1906 খ্রীস্টাব্দ পর্যন্ত উক্ত লাইব্রেরি কর্তৃক সংগৃহীত যাবতীয় গ্রন্থের বিষয়সূচী এই দুই খণ্ডেই সম্পন্ন হয়। তাঁর ভূমিকা থেকে এ বিষয়ে আরও জানা যায় যে এই বিষয়সূচী প্রকাশনায় ব্রিটিশ মিউজিয়াম-গৃহীত পদ্ধতি ব্যবহৃত হয়েছে।

1909 খ্রীস্টাব্দে হরিনাথ ইম্পিরিয়াল লাইব্রেরিতে রক্ষিত ও ভারত সরকারের উদ্যোগে মুদ্রিত যাবতীয় গ্রন্থের এক বিস্তৃত তালিকা (চতুর্থ ভাগ) প্রকাশ করেন। পাঁচ শ তেতাল্লিশ পৃষ্ঠার এই পুস্তক-তালিকার সঙ্গে মুদ্রিত তাঁর ভূমিকাটি মূল্যবান্। তাঁর এই ভূমিকা (21 জুলাই 1909) পাঠে স্পষ্টত জানা যায়, ভারত সরকারের বিভিন্ন বিভাগীয় গ্রন্থাগার থেকে পাওয়া এই বিপুলসংখ্যক সরকারী প্রকাশনা অনেক ক্ষেত্রে অসম্পূর্ণ। 1902 খ্রীস্টাব্দে সরকারী সাহায্যে এই অসম্পূর্ণতা অবশ্য অনেকাংশে দূর করার চেষ্টা হয়। তারপর থেকে সরকারী প্রকাশনার (গোপনীয় রিপোর্ট ছাড়া) এক কপি নিয়মিত এই লাইব্রেরিতে আসতে থাকে। 1905 খ্রীস্টাব্দ থেকে অনুরূপ প্রকাশনা পাঠানোর ব্যবস্থা এদেশের করদ রাজ্যগুলির ক্ষেত্রেও প্রযুক্ত হয়। হরিনাথ প্রকাশিত এই গ্রন্থ-তালিকার পরিকল্পনায় বিষয়-ভিত্তিক অনুক্রম রক্ষা করা হয়েছে। এছাড়া প্রকাশনা সম্পর্কে যথাযথ উল্লেখ এই

তালিকায় সুস্পষ্ট। বিষয়গুলিকে সাধারণত বর্ণানুক্রমে ভাগ করায় পাঠকের পক্ষে এই তালিকা খুব সহায়ক হয়। অবশ্য কোনো কোনো বিষয়ে তালিকা রচনার সময় অঞ্চলভিত্তিক শিরোনামও ব্যবহৃত হয়েছে এ বিষয়ে সমগ্র ভারতবর্ষকে বেশী গুরুত্ব দিয়ে বিভিন্ন প্রদেশ এবং অন্যান্য রাজ্যগুলির বিভাগের ক্ষেত্রেও সঠিক বর্ণানুক্রম লক্ষিত হয়। বলা বাহুল্য, এই পুস্তক-তালিকা দুটি আজও পাঠকের কাছে অত্যন্ত সহায়ক ও মূল্যবান্।

আর শুধু গ্রন্থাগারের সংগঠনের কাজেই নয়, হরিনাথ এই সময় বিদ্যাচর্চায় উৎসাহী বহু ব্যক্তিকে নানাভাবে সহযোগিতা করেছেন। প্রসঙ্গক্রমে তাঁর খ্যাতিমান ছাত্র রাধাগোবিন্দ বসাকের নাম উল্লেখ্য। পূর্ববঙ্গ ও আসাম সরকারের রিসার্চ স্কলার হিসাবে তিনি হরিনাথের তত্ত্বাবধানেই কাজ করেন (1908-1910)। স্বাধীন ভারতের প্রথম শিক্ষামন্ত্রী মওলানা আবুল কালাম আজাদ তরুণ বয়সে এই গ্রন্থাগার ব্যবহারের সময় হরিনাথের বন্ধুত্বপূর্ণ সহযোগিতা লাভ করেছিলেন। এ বিষয়ে আরও জানা যায় যে এই গ্রন্থাগারেই হরিনাথ মিশর, চীন, জাপান প্রভৃতি দেশের মানুষের সঙ্গে বিভিন্ন বিষয়ের আলোচনায় ব্যাপৃত থাকতেন। সর্বোপরি তাঁর নিজের অনুশীলন ও গবেষণার ইতিহাসে এই কয়েক বছরের (1907-1911) গুরুত্ব অনেকখানি।

হরিনাথের গ্রন্থাগারিক পদলাভের আগে থেকেই ইম্‌পিরিয়াল লাইব্রেরির কর্মচারীদের মধ্যে নানারূপ দুর্নীতিমূলক কাজকর্ম শুরু হয়েছিল। দুর্ভাগ্যক্রমে তিনি এদেরই সহকারী হিসাবে পেলেন। অধিকন্তু 1908 খ্রীস্টাব্দের জুন মাসে এই লাইব্রেরির প্রধান করণিক জে. এস্. ডি'সিল্‌ভা মারা গেলে তিনি তাঁর বাল্যবন্ধু সরোজেন্দ্র মুখোপাধ্যায়কে উক্ত পদলাভে সহায়তা করেন। আকস্মিকভাবে এই নবাগত প্রধান করণিকের আবির্ভাবে লাইব্রেরির কর্মচারীরা স্বভাবতই ঈর্ষান্বিত হলেন। হরিনাথের অকপট সারল্য ও মহানুভবতার সুযোগ নিয়ে এই কর্মচারীদের অনেকে যথেচ্ছ ব্যবহার করতে থাকেন। এবং ব্যক্তিগতভাবে হরিনাথ অসাধারণ পাণ্ডিত্যের অধিকারী হলেও এই 'সঙ্কটপূর্ণ' প্রতিষ্ঠান পরিচালনার উপযুক্ত দক্ষতা তাঁর ছিল না। নানা কারণে গ্রন্থাগারিকের পদ থেকে তাঁর অপসারণ অনিবার্য হয়ে ওঠে। আর অত্যন্ত দুঃখের বিষয় হল, এই বিষাদময় ঘটনার পিছনে খ্যাতিমান্ ভারত সন্তানেরা সক্রিয় ছিলেন। বিদ্যা-চর্চায় একান্তভাবে ব্যাপৃত একজন বিস্ময়কর মানুষের এমন মর্মান্তিক পরিণতিই সম্ভবত স্বাভাবিক। এ প্রসঙ্গে ড: আব্‌দুল্লাহ অল্-মামুন্ সুহ্‌রাবর্দির মূল্যবান মন্তব্যটি মর্মস্পর্শী: "জ্ঞানচর্চা ও গবেষণার ক্ষেত্রে হরিনাথ দে'র বিশিষ্ট যোগ্যতা ছিল; তৎসত্ত্বেও তাঁর কোমল স্বভাব, দানশীল ও উদার মানসিকতা নিয়ে সঙ্কটপূর্ণ একটি বিভাগের প্রধান হওয়ার যোগ্যতা তাঁর ছিল না। সকলেই এই বিপুল আশা পোষণ করতেন যে তাঁর প্রগাঢ় পাণ্ডিত্য ফলদায়ক হবে আর ঠিক সেই সময় ইম্‌পিরিয়াল

লাইব্রেরির আকাশে হঠাৎ মেঘ দেখা দিল। ইম্পিরিয়াল লাইব্রেরির ভয়াল দেওয়াল-গুলি ইতিমধ্যে প্রথম গ্রন্থাগারিকের অকালমৃত্যুর চিহ্ন বহন করছিল। তাঁর পূর্ব-গামীদের আমলে নিম্নপদস্থ কর্মচারীদের এমন সব দুর্নীতি জানা যায়নি, যা এবারে লোকচক্ষুর গোচরে আনা হল। আর এক বিস্তারিত সরকারী তদন্তকার্যের সুবিধার্থে হরিনাথ দে 20 জানুয়ারি 1911 গ্রন্থাগারের কাজ থেকে সরে দাঁড়ান।"

হরিনাথের পরে ইম্পিরিয়াল লাইব্রেরির গ্রন্থাগারিক হন জন্ আলেগজাণ্ডার চ্যাপ্-ম্যান্। পরবর্তীকালে তিনি হরিনাথ সম্পর্কে কিছু আলোচনা করেন। হরিনাথের কর্ম-জীবনের বিষাদময় পরিণতি সম্পর্কে তাঁর মন্তব্য যথেষ্ট আলোকপাত করে। এই লাই-ব্রেরিতে যখন গুরুতর সঙ্কট দেখা দিয়েছে, সেই সময় তাঁর সঙ্গে হরিনাথের সাক্ষাৎকারের এক বিবরণ এ আলোচনায় আছে। চ্যাপ্ম্যান্ সাহেব লিখেছেন: "আমার সঙ্গে বসে তিনি এমন একটি স্বরে অতি দ্রুতভাবে কথা শুরু করলেন যে তাঁর কণ্ঠস্বর আমার কাছে অপরিচিত বোধ হতে লাগল। তিনি যা বলছিলেন তা বোঝাও হল দুঃসাধ্য। তারপর আমি যখন বুঝতে পারলাম যে তিনি বরখাস্ত প্রধান করণিকটিকে গালিগালাজ করছেন কিংবা তার স্বরূপ উদ্ঘাটন করছেন তখন আমি তাঁর কথা শোনা বন্ধ করলাম। কেননা এই কাজগুলি আমারই ছিল। আর আমি অন্য কিছু ভাবতে শুরু করলাম। তখন তিনি কথা থামালেন আর তাঁর চেয়ারে নড়েচড়ে বসলেন। তারপর তিনি আবার বলতে শুরু করলেন। এবারে শোনা গেল তাঁর সেই অতি পরিচিত স্বর। যেসব কথায় তিনি চির অভ্যস্ত ছিলেন এখন তিনি তাই নিয়েই বলছিলেন। 200 খ্রীস্টাব্দের পরবর্তীকালের লাতিন নাটক ইত্যাদি তাঁর আলোচনার বিষয় ছিল। যদি আপনারা কেউ যে কোনও লাতিন নাটক থেকে একটি পঙ্ক্তি উদ্ধার করতেন সাধারণত তিনি ঠিক তার পরের পঙ্ক্তিটি আপনাদের যুগিয়ে দিতে পারতেন। অন্তত আমি তাই শুনেছি। সবশেষে তিনি উঠলেন আর দাঁড়িয়ে পড়লেন আমার সামনে। তাঁর বিরাট গোলাকৃতি মুখমণ্ডলে একটি দিব্য আভার মত কিছু বিচ্ছুরিত হচ্ছিল। আর আমি জাদুঘরে দেখা বুদ্ধের মুখমণ্ডলগুলির কথা ভাবছিলাম। তারপরে তিনি বললেন, চ্যাপ্ম্যান্, এইসব ব্যাপার চুকে গেলে আমি তোমাকে কতকগুলি বিষয় জানাব, যেগুলি তুমি নিজে উদ্ঘাটিত করতে পারনি। তদন্তপর্ব শেষ হওয়ার আগেই তিনি মারা গেলেন। তাই তিনি আর আমাকে বলতে পারেননি। কিন্তু তিনি নিশ্চয়ই তা বলতেন। তিনি ছিলেন সেই জাতের মানুষ।"

চ্যাপ্ম্যান্ সম্ভবত নিজেও জানতেন যে আসল সত্যটি তাঁর তদন্তে সম্পূর্ণ অপ্রকাশিতই থেকে গেল। হরিনাথ সেই সত্য প্রকাশের যে আভাস তাঁকে দেন তাতে তিনি বিচলিত না হয়ে পারেননি। যে মানসিক চাঞ্চল্যের সঙ্গে হরিনাথের দুর্জ্ঞেয় উক্তিকে তিনি গ্রহণ করেছিলেন তাতে প্রমাণিত হয় যে তিনি আপন তদন্তের

অসম্পূর্ণতা সম্পর্কে সচেতন ছিলেন। সর্বোপরি হরিনাথের সঙ্গে তাঁর উক্ত সাক্ষাৎকারে একটি বিষয় স্পষ্ট হয়। চাকরিক্ষেত্রে এই বিপর্যয় হরিনাথের মানসিকতায় কোনো নৈরাশ্যের ছায়াপাত ঘটাতে পারেনি। এ সমস্তকে তিনি ধরে নিয়েছিলেন বাইরের ঘটনা হিসাবেই। সুতরাং তাঁর বিদ্যাচর্চায় যে কোনো ব্যাঘাত ঘটেনি তাই নয়, তিনি সময়কে সম্পূর্ণভাবেই ব্যবহার করতে পেরেছিলেন।

প্রসঙ্গক্রমে কলকাতা থেকে তাঁর মাকে লেখা হরিনাথের একটি চিঠি (3 মার্চ 1911) উদ্ধার করা যায়: "আপনার পত্র পাইয়া যারপরনাই আনন্দিত হইলাম। আপনি যে আমাকে ক্ষমা করিয়াছেন তাহাতে আমার কতশত উন্নতির পথ পরিষ্কার হইল।

"মানুষের বাঁচিয়া থাকাই পরম সৌভাগ্য। এবং মানুষ বাঁচিয়া থাকিলে কোন না কোন সময় ঈশ্বর তাঁহার অসীম করুণায় মানুষকে যথার্থ পথ দেখাইয়া দেন। আমারও অবস্থা গত তিন বৎসরের মধ্যে সেইরূপ হইয়াছে এবং ক্রমে ক্রমে ঈশ্বরের কৃপায় জগতের যাবতীয় বস্তুর হাত হইতে এড়াইতে শিখিতেছি। আশা করি এই পথ হইতে জীবনে স্খলিত হইব না।

"আমার ভবিষ্যতের বিষয় আমার কোন ভয় কিংবা ভরসা মনে আনি না। ভবিতব্যের গতি মানুষ কখনও রোধ কিংবা পরিবর্তন করিতে পারে না। তাহার দৃষ্টান্ত নাটু এবং আমি এবং সরোজের বিবেচনাহীনতা এবং দুর্ভাগ্য। ব্যাঘ্র যে মানুষকে খায় তাহাতে ব্যাঘ্রের কি দোষ? কারণ মানুষের মাংস খাওয়া তার স্বভাব। কিন্তু মানুষের ব্যাঘ্র হইতে সাবধান হওয়া কর্তব্য।... আমি এইসব কথা লিখিয়া কাহাকেও দোষ দিতেছি না। সকলেই নিজের কর্মফল ভোগ করে। ঈশ্বরও মধ্যে মধ্যে দেখাইয়া দেন যে মানুষেরা সকলে স্বীয় স্বীয় পথ অবলম্বন করুক।...

"আমার কাজের বিষয় কিছুই ভাবিবেন না। কারণ ঈশ্বর যাহা করেন মানুষের মঙ্গলের নিমিত্ত করেন। এই নাড়াচাড়াতে যে আমার ভাল হইবে তাহা আমার ধ্রুব বিশ্বাস। আমি এর মধ্যে আপনার সহিত কিছুক্ষণের জন্য বৈদ্যনাথ আসিয়া সাক্ষাৎ করিব।

"ঠাকুর মহাশয়কে আমার কোটি কোটি প্রণাম দিবেন। বলিবেন যে আমার মনের বিশ্বাস তাঁহার কথাতে আরও অধিক দৃঢ় হইল। ধরুন যদি চাকরিই যায় (এটা অবশ্য অসম্ভব) ঈশ্বর যখন মুখ দিয়াছেন নিশ্চয় আহারও দিবেন। আর কেহ কাহারও কপাল কাড়িয়া লইতে পারে না। আমার ঈশ্বর ৺পিতাঠাকুরকে মহেশচন্দ্র ন্যায়রত্ন সংস্কৃত কলেজ থেকে তাড়াইয়া দিয়াছিলেন। কিন্তু তাহাতে তাঁহার হিত ছাড়া অহিত হয় নাই। আমিও নিজের কথা সেইরূপ মনে করি। যদি ভবিতব্যের স্রোতে আমার উন্নতি থাকে তাহা হইলে কেহ রোধ করিতে পারিবে না। যদি না থাকে তাহা হইলে দুঃখিত হইবার কোন কারণ নাই।..."

চ্যাপ্‌ম্যানের পূর্বোক্ত বিবরণীতে এ প্রসঙ্গে হরিনাথের ব্যক্তিত্বের যে অশান্ত প্রতিক্রিয়ার আভাস আমরা পাই, এই চিঠিতে তা সম্পূর্ণ অনুপস্থিত। যে সহজ ও সরলভাবে তিনি এখানে নিজের অসতর্কতার কথা স্বীকার করেছেন, সমস্ত সঙ্কটটিতে ব্যক্তিগত দায়িত্বের সুস্পষ্ট ইঙ্গিত দিয়েছেন, তা তাঁর স্বভাবের দুর্লভ বৈশিষ্ট্যের সাক্ষ্য। এই ঘটনায় বিন্দুমাত্র বিচলিত না হয়ে সাহসের সঙ্গে জীবনকে গ্রহণ করার প্রস্তাব রাখতে হরিনাথের হৃদয় একটুও কম্পিত হয়নি। অর্ধ সত্য এবং মিথ্যার বিপুল কারসাজির সামনে সাময়িক পরাজয়কে তিনি মোটেই গ্রাহ্য করেননি। চৌত্রিশ বছর বয়সে হঠাৎ মারা না গেলে হরিনাথ কী ভাবে নিজের লক্ষ্যে স্থির থাকতেন, আমাদের দেশের সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ডের ইতিহাসে তা একটি বিশিষ্ট অধ্যায়ের সংযোজন হতে পারত। এখানে ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের দৃষ্টান্তটি প্রাসঙ্গিকভাবে মনে আসে। কলকাতার সংস্কৃত কলেজের সহকারী সচিবের পদ ত্যাগ করলে তিনি আর কী করবেন, এই নির্বোধ প্রশ্নে ঈশ্বরচন্দ্র ঘোষণা করেন যে দরকার হলে তিনি আলু-পটল বেচে দিনাতিপাত করবেন। পরিবেশের ফন্দিবাজি ও খেলোয়াড়ীকে অগ্রাহ্য করার এই সহজ মনুষ্যত্ব পৃথিবীর যে কোনো সমাজেই দুর্লভ। বড় চাকরির ব্যাপারে মেরুদণ্ডহীন মানুষদের তোষামোদ করতে আজও মানুষ বিন্দুমাত্র লজ্জিত নয়। জাতীয় জীবনের এই অন্তঃসারশূন্য পটভূমিকায় ব্যক্তিত্বের অতি প্রয়োজনীয় এক দৃঢ়তা তরুণ বয়সেই হরিনাথ অর্জন করেছিলেন।

অমূল্য সংগ্রহশালা

পূর্বেই বলা হয়েছে যে হরিনাথ আজীবন বিদ্যাচর্চায় ব্যাপৃত ছিলেন। দুষ্প্রাপ্য পুস্তক ও পুঁথি সংগ্রহে স্বভাবতই তাঁর অপরিসীম অনুরাগ ছিল। যেসব বিষয়ে তাঁর আগ্রহ ছিল সে সম্পর্কে অসংখ্য মূল্যবান্ গ্রন্থ সংগ্রহেই এই পুস্তকপ্রেমিক উৎফুল্ল হতেন না, বিদ্যানুরাগী বন্ধু ও পরিচিতজনকে তিনি সমানে বই উপহার দিতেন। কলকাতার প্রেসিডেন্সি কলেজে অধ্যাপনা করার সময় তিনি তাঁর সহকর্মী হেনরি আর্নেস্ট স্টেপলটন্‌কে এক অতি দুর্লভ গ্রন্থ উপহার দেন। এই গ্রন্থের নাম 'পূর্ববঙ্গের জাতি, বর্ণ ও ব্যবসা-বাণিজ্য।' ইংরেজীতে লেখা এই গ্রন্থের রচয়িতা ছিলেন জেমস ওয়াইজ (James Wise)। গ্রন্থটি অতি দুষ্প্রাপ্য ; কেননা মাত্র বারো কপি মুদ্রিত হয়েছিল। বলা বাহুল্য, স্টেপলটন্ সাহেবের ভবিষ্যৎ গবেষণার ক্ষেত্রে এই উপহার অত্যন্ত সহায়ক হয়।

ইংল্যান্ড থেকে সরাসরি ভারতীয় শিক্ষাবিভাগে চাকরি গ্রহণ করে স্বদেশে ফেরার সময় (1901) হরিনাথ সঙ্গে আনেন অনেক মূল্যবান্ গ্রন্থ। দ্বিতীয়বার ইওরোপ ভ্রমণকালেও (1906) তাঁর বিভিন্ন কর্মসূচীর মধ্যে প্রয়োজনীয় পুস্তক সংগ্রহ ছিল অন্যতম। সর্বোপরি ইম্‌পিরিয়াল লাইব্রেরির গ্রন্থাগারিক নিযুক্ত হওয়ার পরেও তিনি তাঁর ব্যক্তিগত সংগ্রহের ব্যাপারে সমানে আগ্রহী ছিলেন। জীবনের শেষ ছ' বছরে প্রতি মাসে হরিনাথ প্রায় তিনশ' টাকার বই কিনতেন। এইভাবে হাজার সাতেক পুস্তক ও পুঁথিতে ভরে উঠেছিল তাঁর ব্যক্তিগত সংগ্রহ। হরিনাথের মৃত্যুর সাত দিন পরে সংবাদপত্রে প্রকাশিত বিবরণ থেকে জানা যায় যে তাঁর সংগৃহীত এই মূল্যবান্ পুস্তক ও পুঁথির দাম ছিল প্রায় পঁচিশ হাজার টাকা।

বলা বাহুল্য নিজের গবেষণার সূত্রে হরিনাথ স্বদেশ থেকে অনেক দুষ্প্রাপ্য পুস্তক ও পুঁথি উদ্ধার করেন। বাংলাদেশের এক গ্রাম থেকে তিনি আবিষ্কার করেন কালিদাসের 'অভিজ্ঞান-শকুন্তল'-এর প্রাচীনতম পাণ্ডুলিপি। বার্লিনের ইম্‌পিরিয়াল লাইব্রেরিকে তিনি এই পাণ্ডুলিপিটি উপহার দেন। তুর্কী ও পারসীক ভাষায় লেখা বইরাম খান (Bayram Khan)-এর সমগ্র কবিতার একমাত্র পাণ্ডুলিপির তিনি সন্ধান পান ঢাকায়। তুর্কী ভাষায় ই. ডেনিসন রসের আগ্রহ দেখে হরিনাথ তাঁকে এই পাণ্ডুলিপিটি দিয়েছিলেন। পরবর্তীকালে এই কবির রচনাসংগ্রহ রস্ সাহেবের সম্পাদনায় প্রকাশিত হয়।

দেশবিদেশের বিখ্যাত বইয়ের ব্যবসায়ী থেকে শুরু করে কলকাতার পুরনো পুস্তক-বিক্রেতা পর্যন্ত সকলেই হরিনাথের ব্যক্তিগত সংগ্রহে গ্রন্থ সরবরাহ করতেন। মৃত্যুর মাত্র কয়েকদিন আগেও তাঁর নামে ফরাসীদেশ থেকে পঞ্চাশখানা বই আসে। দুর্ভাগ্যক্রমে এই বইগুলি তিনি নিজে আর দেখার সুযোগ পেলেন না। আর আশ্চর্যের বিষয় এই যে তাঁর মৃত্যুসংবাদ পেয়ে ফরাসী পুস্তক-বিক্রেতা বইগুলির দাম গ্রহণ করতে

রাজী হননি। পরবর্তীকালে তাঁর আত্মীয়েরা এই বইগুলি কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগারে উপহার দেন। একদিন কলকাতার কলেজ স্ট্রীটের একটি সাধারণ পুরনো বইয়ের দোকান থেকে তিনি ওয়ারেন হেস্টিংসের স্বহস্তে লেখা একখানি চিঠি আবিষ্কার করেন। কলকাতার ইম্পিরিয়াল লাইব্রেরিকে তিনি এই চিঠিটি উপহার দিয়েছিলেন।

হরিনাথের ব্যক্তিগত সংগ্রহে পুঁথি সংরক্ষণের বিষয়টি বিশেষভাবে উল্লেখ্য। বলা বাহুল্য, অনুরাগ ও পরিশ্রমে তিনি তিব্বতী, চীনা, সংস্কৃত, আরবী, পারসীক প্রভৃতি ভাষার বহু দুষ্প্রাপ্য পুঁথি সংগ্রহ করেন। এই পুঁথি সংগ্রহের উৎসাহে তিনি অনেক সময় নিজের অসুবিধার কথা পর্যন্ত চিন্তা করেননি। পুঁথির স্থায়িত্বের জন্য সঠিক প্রতিলিপিকরণ প্রভৃতি বহু ব্যয়সাপেক্ষ পদ্ধতিরও তিনি সমানে সদ্ব্যবহার করেছেন। এই ভাবেই তিলে তিলে গড়ে উঠেছিল তাঁর অমূল্য সংগ্রহ।

সতীশচন্দ্র ঘোষ নামে হরিনাথের এক বিদ্যানুরাগী বন্ধু তাঁকে বৌদ্ধশাস্ত্রের দুই বৃহৎ তিব্বতী অনুবাদ সংকলন উপহার দেন। এই দুই মহামূল্য মহাকোষ, 'বুদ্ধবচন' এবং 'শাস্ত্র' প্রায় চার হাজার মূল্যবান্ ও দুষ্প্রাপ্য গ্রন্থের সংগ্রহ। কিন্তু তার স্বল্পকালের মধ্যেই হরিনাথ মারা যান আর তাই তাঁর পক্ষে এ বিষয়ে বিস্তৃত গবেষণার কাজ সম্ভবপর হয়ে ওঠেনি।

দুর্ভাগ্যক্রমে হরিনাথের মৃত্যুর পর তাঁর পরম সাধের প্রায় সমস্ত সংগ্রহটিই মাত্র হাজার তিনেক টাকায় বিক্রি হয়ে যায়। অবশিষ্ট যে সামান্য কয়েকখানি পুস্তক ও পাণ্ডুলিপি বন্ধু ও পরিজনদের হাতে ছিল তাদের সন্ধান এখনও পাওয়া যায়। প্রসঙ্গত দারা শিকোহ কৃত পারসীক ভাষায় বেদের অনুবাদের কথা উল্লেখ্য। 1939 খ্রীস্টাব্দের 4 ফেব্রুয়ারি হরিনাথের স্ত্রী শরৎশোভা দেবীর কাছ থেকে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ এই দুষ্প্রাপ্য গ্রন্থটি পাঁচশ টাকায় কিনে নেন। হরিনাথের ছাত্র ডঃ রাধাগোবিন্দ বসাকের বাড়িতে একদিন বর্তমান জীবনীকারের একটি মূল্যবান্ গ্রন্থ দেখার সৌভাগ্য হয়েছিল। এই গ্রন্থটি মহারাষ্ট্রী প্রাকৃত ভাষায় লেখা প্রবরসেনের 'রাবণবধ' মহাকাব্যের এক জার্মান সংস্করণ। 1880 খ্রীস্টাব্দে প্রকাশিত জিগ্‌ফ্রীট্ গোল্ডশ্‌মিট্ (Sigfried Goldschmidt) সম্পাদিত 'রাবণবহো বা সেতুবন্ধ' নামক এই গ্রন্থটি হরিনাথের সংগ্রহের অন্তর্ভুক্ত ছিল।

মানুষ ও পুস্তকপ্রেমিক হরিনাথের চরিত্রের এই দিকটি সম্পর্কে ই. ডেনিসন্ রসের আত্মজীবনীতে একটি চমৎকার বিবরণী মেলে। তিনি লিখেছেন: "মানুষ এবং বই আবিষ্কারের ব্যাপারে হরিনাথের ছিল তৃতীয় নয়ন। হঠাৎ যে কোনও সময়ে তাঁর আবির্ভাব ঘটতে পারত আমার বাড়িতে, সঙ্গে হয়তো কোনো জাপানী বৌদ্ধ সন্ন্যাসী, অথবা আরব বেদুইন, নতুবা বাজার থেকে সংগ্রহ করা কোনো দুষ্প্রাপ্য গ্রন্থের প্রথম সংস্করণ।"

হৃদয়বত্তা

হরিনাথের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যের আলোচনায় প্রথমেই উল্লেখ্য তাঁর দানশীলতার কথা। কন্যাদায়গ্রস্তের প্রতি করুণা আমাদের সমাজে বিরল নয়। কিন্তু হরিনাথের মতন নিজের সংসারের আগামীকালের সমস্যার কথা বিন্দুমাত্র না ভেবে অকাতরে বিপন্নের প্রতি মহানুভবতার উজ্জ্বল উদাহরণ সর্বদেশে এবং সর্বকালেই দুর্লভ। একটি ঘটনা। একবার জনৈক কন্যাদায়গ্রস্ত ভদ্রলোক তাঁর কাছে কিছু সাহায্যের আশায় আসেন। সে সময় এই প্রয়োজন মেটাবার মতন অর্থ তাঁর কাছে ছিল না। তাই তিনি প্রথমে বেশ চিন্তিত হন। কিন্তু একটু পরেই তাঁর মনে পড়ল যে সেই দিনই তিনি বেতন বাবদ বার শ টাকার একটি চেক পেয়েছেন। তখন মুহূর্তের মধ্যেই তিনি স্বচ্ছন্দে ভদ্রলোকের হাতে চেকটি তুলে দিলেন। এই ভাবেই তিনি আজীবন অসংখ্য অভাবী মানুষের ব্যক্তিগত সমস্যা সমাধানে সহায়তা করেছেন।

আর আশ্চর্যের বিষয়, হরিনাথের এই অতুলনীয় দানের পরিমাণ কেউই সঠিক জানতেন না। কেননা এ বিষয়ে তিনি যিশু খ্রীস্টের উপদেশ পালন করতেন অক্ষরে অক্ষরে। তাঁর ডান হাতের কাজের ব্যাপার তিনি কখনও বাম হাতকে জানতে দিতেন না। তবুও তাঁর প্রিয় ছাত্র ও বন্ধুদের লেখায় এ সম্পর্কে কিছু প্রত্যক্ষ বিবরণ পাওয়া যায়। তাঁর আয়ের অনেকখানিই গরীব ছাত্র ও অন্যান্য অভাবীদের সহায়তায় ব্যয়িত হত। তাই তাঁর মৃত্যুর পর অনেক ঘরে বিষাদ নেমে এসেছিল। এইসব দরিদ্র মানুষেরা হরিনাথকে তাঁর দানশীলতার মধ্য দিয়েই জানত।

প্রসঙ্গক্রমে হরিনাথের ছাত্র অঘোরনাথ ঘোষ লিখেছেন: "যে কেহ যখন তাঁহার কাছে আসিয়া হাত পাতিয়াছে, তখনই সাহায্য পাইয়াছে, নিতান্ত পক্ষে কেহ বিফল মনোরথ হইয়া ফিরে নাই। সে জন্য তাঁহাকে সময়ে সময়ে পরের নিকট ঋণ করিতে হইয়াছে, অনেক রকম অসুবিধায় পড়িতে হইয়াছে কিন্তু তথাপি বিপন্নকে সাহায্য করিতে তিনি বিমুখ হন নাই। এমন অবস্থায়ও পড়িতে হইয়াছে যে তিনি হয়ত পাওনাদারকে টাকা দিতে প্রতিশ্রুত হইয়াছেন, সে নির্ধারিত দিনে আসিয়া উপস্থিত, তাহাকে টাকা দিবার জন্য টাকা বাহির করিয়াছেন, এমন সময় একজন বিপন্ন ব্যক্তি সাহায্য প্রার্থনা করিল, তিনি তখনই আর দ্বিতীয়বার চিন্তা না করিয়া সেই টাকার সমস্ত বা কতকাংশ তাহাকে দিয়া ফেলিলেন। পাওনাদার হয়ত অসন্তুষ্ট হইল, দুটা কড়া কথা শুনাইল, তিনি অবনত মস্তকে তাহা সহ্য করিলেন, তথাপি বিপন্নকে বিমুখ করিতে পারিলেন না।"

অসংখ্য অভাবী মানুষকে নির্দিষ্ট ব্যবস্থা অনুযায়ী সাহায্য করা ছাড়া হরিনাথ বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান. সমিতি ইত্যাদিতে সাহায্যদানেও সর্বদা মুক্তহস্ত ছিলেন। দরিদ্র ও বিপন্ন ছাত্রদের সহায়তার জন্য কলকাতা ইউনিভার্সিটি ইন্‌স্টিটিউটে যে ধনভাণ্ডার গড়ে ওঠে তা প্রকৃতপক্ষে তাঁরই প্রতিশ্রুতি ও সাহায্যেই সম্ভবপর হয়েছিল। ছাত্ররা তাঁদের এই সহৃদয় অধ্যাপকের সহায়তা ও সহযোগিতা ভিন্ন কিছুতেই এমন গুরুত্বপূর্ণ পরিকল্পনা কার্যকরী করতে সাহসী হতেন না।

আর ছাত্রদের শুধুমাত্র আর্থিক সাহায্যেই হরিনাথ ক্ষান্ত হতেন না, অন্যান্য নানা প্রকারে তিনি ছাত্রদের সহায়তা করতেন। পরীক্ষক হিসাবে তিনি কখনও ছাত্রদের প্রতি অযথা কঠোরতা প্রদর্শনে অভ্যস্ত ছিলেন না। এমন কি বিশ্ববিদ্যালয়ের কোনও পরীক্ষার ফল সম্পর্কে কোনও ছাত্রের প্রকৃত সন্দেহ হলে তিনি সে বিষয়ে সাগ্রহে সহযোগিতা করেছেন। পরীক্ষার প্রশ্নপত্র অযথা কঠিন কিংবা পাঠ্য তালিকা বহির্ভূত হলে ছাত্ররা তাঁরই সাহায্য সর্বাগ্রে কামনা করতেন। অবান্তর ও অসঙ্গত না হলে ছাত্রদের কোনো অনুরোধই তিনি প্রত্যাখ্যান করতে পারতেন না।

সর্বোপরি নিজের ছাত্রদের ওপর হরিনাথের অপরিসীম আস্থা ছিল। ছাত্ররা যে কখনও অধ্যাপকের সঙ্গে মিথ্যাচরণ বা কোনো কপটতার আশ্রয় গ্রহণ করতে পারেন, তা সম্পূর্ণই তাঁর অচিন্তনীয় ছিল।

বিদেশী সাধারণ মানুষ সম্পর্কেও ভাষাপ্রেমিক হরিনাথের স্বাভাবিক অনুরাগ ছিল। মিশর থেকে আগত এক কপটিক খ্রীস্টান যুবকের সঙ্গে তাঁর সম্পর্কের কথা এখানে খুব প্রাসঙ্গিক। ঘটনাটি এই। কলকাতার প্রেসিডেন্সি কলেজে অধ্যাপনাকালে একদিন বিকালবেলায় হরিনাথ তাঁর 78 ধর্মতলা স্ট্রীটের বাড়িতে হেঁটে ফিরছেন। ওয়েলিংটন স্কোয়ারের কাছে এসে তিনি দেখলেন এক জায়গায় বেশ ভীড় জমেছে। আর সেই ভীড়ের মাঝখানে দাঁড়িয়ে এক যুবক সমানে বক্তৃতা দিয়ে চলেছে। শ্রোতাদের অধিকাংশই মুসলমান। কৌতূহলবশত হরিনাথ সেই বক্তৃতা শুনতে লাগলেন। একটু শুনেই তিনি বুঝলেন যুবকটি আরবী ভাষায় বক্তৃতা দিচ্ছে। আর কিছুক্ষণ এই বক্তৃতা শোনার পর তিনি প্রায় বিস্ময়ে হতবাক্ হলেন। কেননা যুবকটি সেই মুসলমানদের মধ্যে দাঁড়িয়ে ইসলাম ধর্মের মহান্ গুরু মহম্মদকে তীব্র আক্রমণ করে বক্তৃতা দিয়ে চলেছে। অবশ্য যুবকটির ভাগ্য খুবই ভাল। কারণ এই মুসলমান শ্রোতাদের কারো আরবী ভাষায় বিন্দুমাত্র জ্ঞান ছিল না। সুতরাং যুবকটির বক্তৃতার বিষয় শ্রোতারা কিছু বুঝতে পারেনি। তারা যুবকটিকে পাগল ভেবে মজা দেখছিল। হরিনাথ এই যুবকটির অবশ্যম্ভাবী বিপদের কথা ভেবে তার কাছে এগিয়ে গেলেন এবং আরবী ভাষায় কথাবার্তা শুরু করলেন। শেষ পর্যন্ত অনেক বোঝানোর পর এই যুবককে সঙ্গে নিয়ে তিনি বাড়ি ফিরলেন। এই যুবকটির নাম ছিল রিজ্‌কুল্লাহ,

মালাতি (Rizqeallah Malati)। হরিনাথের পরিবারে সে জন্ সাহেব নামেই পরিচিত ছিল। প্রায় বছর দুয়েক তাঁর বাড়িতে এই যুবক আপন আত্মীয়ের মত ছিল। যুবকটি যাতে তার দেশের খবরাখবর পায় সেজন্য হরিনাথ তাকে একটি মিশরীয় সংবাদপত্রের গ্রাহকও করে দেন।

শুধু এই যুবকই নয়, তৎকালীন অনেক দেশীবিদেশী গুণিজনও হরিনাথের পক্ষপুটে আশ্রয় পেতেন। প্রসঙ্গক্রমে পালি ভাষা ও সাহিত্যে সুপণ্ডিত ধর্মানন্দ কোসম্বীর নাম উল্লেখ্য। কলকাতায় এসে তিনি কিছুদিন ৫নং ললিতমোহন দাস লেনে অবস্থিত বৌদ্ধধর্মাঙ্কুর মঠে ছিলেন। হরিনাথ সেখান থেকে এই পণ্ডিতকে সাগ্রহে নিজের সংসারে থাকার অনুরোধ জানান। মহারাষ্ট্রের এই বিখ্যাত সন্তান সন্ন্যাস ত্যাগ করে পুনরায় গৃহী হওয়ার সঙ্কল্প করেন। আর এই সময় তিনি কয়েক বছর হরিনাথের ধর্মতলা স্ট্রীটের ভাড়াবাড়িতে পরম আত্মীয়ের মতই কাটাতে পেরেছিলেন। ধর্মানন্দ অবশ্য হরিনাথের বাসস্থানে খাওয়াদাওয়া করলেও থাকতেন নলিনী পালিতের বাড়িতে। পালিত মহাশয় ছিলেন সম্পর্কে হরিনাথের খুড়শ্বশুর। তাঁর এই বাড়িটি ছিল হরিনাথের ধর্মতলা স্ট্রীটের বাসস্থানের কাছাকাছি। হরিনাথের নিজের বাসস্থানে বড় বেশী লোকজন যাতায়াত করত। আর ধর্মানন্দের তাতে অসুবিধার আশঙ্কা অনুভব করেই তিনি এরূপ ব্যবস্থা করেন। ধর্মানন্দের কাছে হরিনাথ এবং পরে হাভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের বিখ্যাত অধ্যাপক চার্লস রক্‌ওয়েল্ ল্যান্‌ম্যান্ (Charles Rockwell Lanman) পালি ভাষা ও সাহিত্যের অনুশীলন করেন। বৌদ্ধদর্শনের প্রতি হরিনাথের অনুরাগের ভিত্তি এই পণ্ডিতের সংস্পর্শে এসেই দৃঢ়তর হয়। মারাঠী ভাষায় লেখা ধর্মানন্দের আত্মজীবনীতে হরিনাথ সম্পর্কে অনেক কৌতূহলকর কাহিনী বর্তমান। 1905 খ্রীস্টাব্দের 26 ডিসেম্বর তিব্বতের ষষ্ঠ তাশিলামা (Tashi Lama VI) কলকাতায় আসেন। এই সময় বৌদ্ধধর্মাঙ্কুর সভার পক্ষ থেকে তাঁকে যে সংবর্ধনা দেওয়া হয় সে বিষয়ে হরিনাথই উদ্যোক্তা ও অগ্রণী ছিলেন। 1906 খ্রীস্টাব্দে ধর্মানন্দ সিকিমে যেতে মনস্থ করলে হরিনাথ নিজের সাধ্যমত তাঁর যাতায়াতের সুব্যবস্থা করেন। শুধুমাত্র আর্থিক সাহায্যই নয়, বৌদ্ধধর্মাঙ্কুর সভার পক্ষ থেকে হরিনাথ সিকিমের মহারাজাকে একটি চিঠিও লিখেছিলেন। কেননা সিকিমের মহারাজা এই সভার পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। এছাড়া আর একটি ব্যক্তিগত চিঠিতে হরিনাথ সিকিমবাসী তাঁর বন্ধু ক্লড্ হোয়াইট্ (Claude White)-কে সবিস্তারে ধর্মানন্দের পরিচয় জানান। কেননা ধর্মানন্দের বৌদ্ধশাস্ত্রচর্চায় সিকিমের এই প্রতিপত্তিশীল ইংরেজ নাগরিকের সহযোগিতা স্বভাবতই মূল্যবান্। সিকিম থেকে ফেরার পরেও ধর্মানন্দ দীর্ঘকাল হরিনাথের পরিবারে আপনজনের মতন অতিবাহিত করেন। ধর্মানন্দের সঙ্গে তাঁর ঘনিষ্ঠ বন্ধুত্ব ছিল। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে ধর্মানন্দের অধ্যাপনার কাজ এবং পালি ভাষার ব্যাকরণ 'বালাবতার' সম্পাদনার বিষয়ে হরিনাথ সর্বদা সহযোগিতা করেছেন।

মৌলবী আবু মূসা আহ্‌মদুল হক্ এই সময় হরিনাথের ধর্মতলা স্ট্রীটের ভাড়াবাড়িতে বসবাস করেন। ঢাকা কলেজে অধ্যাপনা করার সময় তাঁর সঙ্গে এই মৌলবী সাহেবের পরিচয় হয়। মৌলবী সাহেব সে সময় ঢাকার কলেজিয়েট স্কুলের শিক্ষক ছিলেন। ঢাকা কলেজ থেকে কলকাতার প্রেসিডেন্সি কলেজে বদলি হওয়ার সময় হরিনাথ তাঁকে সঙ্গে আনেন। পরবর্তীকালে তাঁর 30নং বাহির মির্জাপুর রোডের বাড়ির কাছাকাছি তিনি একটি বাড়ি ভাড়া করে এই মৌলবী সাহেবের থাকার সুব্যবস্থা করেন। হরিনাথের একান্ত উৎসাহতেই হক্ সাহেব আরবী সাহিত্যের গবেষণায় ব্যাপৃত হন।

শ্রীঅরবিন্দের মধ্যমভ্রাতা মনোমোহন ঘোষও কিছুদিন পারিবারিক দুর্বিপাকের জন্য হরিনাথের ধর্মতলা স্ট্রীটের বাসস্থানে কাটান। পূর্বেই বলা হয়েছে, ঢাকা কলেজে ও কলকাতার প্রেসিডেন্সি কলেজে তাঁর সহকর্মীদের মধ্যে কবি-অধ্যাপক মনোমোহন অন্যতম ছিলেন। ঢাকা কলেজে অধ্যাপনাকালে হরিনাথ তাঁর এই বন্ধুকে 'আপোল্লো' (Apollo) আখ্যায় অভিহিত করেন। উভয়ের মধ্যে ঘনিষ্ঠ সৌহার্দ ছিল। হরিনাথের এই ভাড়াবাড়িতে থাকার সময়েই মনোমোহনের সঙ্গে ধর্মানন্দ কোসম্বীর আলাপ হয়েছিল। পরবর্তীকালে হরিনাথের মধ্যস্থতায় তাঁর সঙ্গে খ্যাতনামা জাপানী পণ্ডিত ইয়ামাকামি সোগেনের পরিচয় হয়। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে অরবিন্দ ঘোষও এই সময় মাঝে মাঝে হরিনাথের বাড়িতে আসতেন। আর সুযোগ সুবিধামত তাঁদের তিনজনের মধ্যে চলত গ্রীক ও লাতিন সাহিত্যের গভীর আলোচনা।

ওগুস্ত্‌ ফর্তিএ (Auguste Fortier) নামে কানাডাবাসী এক ফরাসী লেখককে হরিনাথ নিজ ব্যয়ে বাহির মির্জাপুর রোডের বাড়ির কাছাকাছি ওয়ার্ডস ইন্‌স্টিটিউশন্ স্ট্রীটে একখানি পুরো বাড়ি ভাড়া করে দিয়েছিলেন। হরিনাথের উৎসাহ ও আগ্রহে তিনি পত্র-পত্রিকায় রচনা প্রকাশ করেন। এছাড়া তিনি ভারতের ইতিহাস সম্পর্কে এক প্রকাণ্ড গ্রন্থরচনায় ব্যাপৃত হন। তাঁকে কলকাতার বিশপ্‌স্ কলেজে ইতিহাসের অধ্যাপক এবং বিশ্ববিদ্যালয়ে ফরাসী ভাষা ও সাহিত্যের পরীক্ষক নিযুক্ত হওয়ার ব্যাপারে হরিনাথ যথেষ্ট সহায়তা করেন। আর এই বিদেশী লেখকের সঙ্গে একত্রে হরিনাথ ফরাসী ভাষায় বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের 'কৃষ্ণকান্তের উইল' অনুবাদ করে প্যারিস্ থেকে প্রকাশনার পরিকল্পনাও করেছিলেন।

নিজের সাধ্যমত এইসব পণ্ডিতদের সহায়তাই নয়, হরিনাথ আরও অনেক গুণিজনের গবেষণায় সাগ্রহে সহযোগিতা করেছেন। 1904 খ্রীস্টাব্দের 10 জানুয়ারি কলকাতার ইয়াং মেনজ্‌ ক্রিস্‌ট্যান অ্যাসোসিয়েশন্ হলে প্রদত্ত এলিয়ট্ ওয়াল্‌টার ম্যাজ্‌ (Elliot Walter Madge) এক মূল্যবান বক্তৃতা দেন। তাঁর এই বক্তৃতার বিষয় ছিল ইউরেশীয় কবি ও সংস্কারক হেনরি লুইস্ ভিভিয়ান ডিরোজিও (Henry Louis Vivian Derozio)-র জীবন ও কর্মের সংক্ষিপ্ত বিবরণী। হরিনাথের অর্থানুকূল্যেই

এই বক্তৃতাটি পুনর্মুদ্রিত হয়। বলা বাহুল্য, এই পুস্তিকার ভূমিকায় লেখক হরিনাথের এই সহৃদয় সহায়তার কথা কৃতজ্ঞচিত্তে স্মরণ করেছেন।

ইতিমধ্যে ঢাকা কলেজে অধ্যাপনা করার সময় হরিনাথের সঙ্গে কবি রবি দত্তের পত্রবিনিময় হত। শেষোক্তজন সাধারণত তাঁর স্বরচিত এবং অনূদিত কবিতা সম্পর্কে হরিনাথের মতামত জানতে চাইতেন। তাঁদের পত্রাবলী আজ পাওয়া গেলে অনুবাদ সম্পর্কে এখন থেকে প্রায় আশি বছর আগে এই দুই অমর অনুবাদকের মতামত সমকালীন অনুবাদ-সমস্যার অনেক জটিল দিকে নিঃসন্দেহে আলোকপাত করত। প্রসঙ্গত বলা যায় যে হরিনাথের পর এদেশে বহুভাষাবিদ্ পণ্ডিত হিসাবে রবি দত্তের নাম স্মরণযোগ্য। 1909 খ্রীস্টাব্দে কেমব্রিজ্ থেকে রবি দত্তের এক মূল্যবান্ অনুবাদ-সংকলন প্রকাশিত হয়। এই অনুবাদ সংকলনে সংস্কৃত, পালি, বাংলা, পারসীক, গ্রীক, লাতিন, প্রভঁসল, ইতালীয়, ফরাসী, স্পেনীয়, পোর্তুগীজ, জার্মান প্রভৃতি ষোলটি ভাষার কবিতার টীকাসহ ইংরেজী অনুবাদ বর্তমান। হরিনাথের পর তিনিই কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের তুলনামূলক ভাষাতত্ত্বের লেকচারার নিযুক্ত হন। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত মাত্র চৌত্রিশ বছরে এই অমূল্য জীবনও শেষ হয়।

হরিনাথের সঙ্গে সুবিখ্যাত ঐতিহাসিক যদুনাথ সরকারের গভীর বন্ধুত্ব ছিল। পারসীক শব্দাবলীর সঠিক অর্থের জন্য তিনি হরিনাথের সহায়তা লাভ করেন। এই সময় হরিনাথ প্রেসিডেন্সি কলেজে পড়াতেন এবং থাকতেন 78নং ধর্মতলা স্ট্রীটে। আর যদুনাথ তখন পাটনা কলেজে অধ্যাপনা করতেন। পরবর্তীকালে কলকাতায় এলে স্বভাবতই তিনি হরিনাথের 30নং বাহির মির্জাপুর রোডের বাড়িতে গিয়ে উপস্থিত হতেন। এছাড়া বিদ্যাচর্চা বিষয়ে তাঁদের দুজনের মধ্যে পত্রবিনিময়ও অব্যাহত ছিল।

মহেঞ্জোদড়োর আবিষ্কারক রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় ছাত্রজীবনে হরিনাথের অন্তরঙ্গ বন্ধু এরনস্ট্ টেওডোর ব্লখের সংস্পর্শে আসেন। আর সেই সূত্রে তাঁর পক্ষে হরিনাথের সাহচর্যলাভ ঘটেছিল। বাংলা দেশের ইতিহাস রচনার সময় (1906) তাঁর হাতে হরিনাথ রাজা হরিবর্মদেবের তাম্রশাসনটি অর্পণ করেন। একথা রাখালদাস নিজেই তাঁর 'বাঙ্গালার ইতিহাস' (প্রথম ভাগ) গ্রন্থে লিখেছেন।

কলকাতার 45নং বেনিয়াটোলা লেনে অবস্থিত মিত্র ইন্স্টিটিউশনের প্রধান শিক্ষক সতীশকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় ছিলেন হরিনাথের গুণমুগ্ধদের অন্যতম। তিনি প্রায়ই হরিনাথের বাহির মির্জাপুর রোডের বাড়িতে আসতেন। 1908 খ্রীস্টাব্দে তাঁর সংকলিত 'বাংলা থেকে বাংলা ও ইংরেজী অভিধান'-এর দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশিত হয়। তাঁর এই কাজে হরিনাথ যথেষ্ট সহযোগিতা করেন। এই বছরে প্রকাশিত তাঁর 'শিক্ষা নির্দেশ' নামক পুস্তিকাটি গভীর শ্রদ্ধার নিদর্শন হিসাবে হরিনাথকে উৎসর্গ করেছিলেন। তাঁর এই পুস্তিকাটি ইংরেজী ভাষায় লেখা। 1909 খ্রীস্টাব্দে তাঁর

একান্ত আগ্রহেই হরিনাথ মিত্র ইনস্টিটিউশনের সভাপতি হন। আজীবন তিনি এই পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। তাঁর পূর্বে এই পদে ছিলেন রাজা প্যারীমোহন মুখোপাধ্যায়।

কলকাতার এশিয়াটিক সোসাইটির গ্রন্থাগারিক সুরেন্দ্রনাথ কুমার 'খুদ্দকপাঠ' (1909) সম্পাদনায় হরিনাথের কাছে তাঁর অপরিশোধ্য ঋণের কথা সশ্রদ্ধচিত্তে স্বীকার করেছেন। বৌদ্ধ ধর্মানুষ্ঠান বিষয়ক নয়টি ক্ষুদ্র সূত্রের সমষ্টি এই 'খুদ্দকপাঠ'। আর তাই ইংরেজী অনুবাদসহ এমন সারগ্রন্থের প্রকাশনায় বৌদ্ধশাস্ত্রে সুপণ্ডিত হরিনাথের সক্রিয় সহযোগিতা ছিল একান্ত স্বাভাবিক।

পূর্বেই বলা হয়েছে যে ঢাকায় থাকার সময় হরিনাথ তুর্কী ও পারসীক ভাষায় লেখা বইরাম খানের সমগ্র কবিতার এক অতি দুষ্প্রাপ্য পাণ্ডুলিপি উদ্ধার করেন। আর আশ্চর্যের বিষয় এই যে তিনি এমন বহুমূল্য রত্নটিকে স্বচ্ছন্দে ই. ডেনিসন রসের হাতে সমর্পণ করলেন। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে এই পাণ্ডুলিপির প্রতিলিপিকার ছিলেন বইরামের পুত্র আবদুর রহিম। 1910 খ্রীস্টাব্দে রস্ সাহেবের সম্পাদনায় বইরামের এই রচনা প্রকাশিত হয়। তুর্কী ও পারসীক ভাষা ও সাহিত্যে নিজের অসাধারণ অধিকার সত্ত্বেও এরূপ সহযোগিতা একমাত্র হরিনাথের মতন বিস্ময়কর মানুষের পক্ষেই বুঝি বা সম্ভবপর ছিল।

বিখ্যাত নাট্যকার গিরিশচন্দ্র ঘোষের সঙ্গেও হরিনাথের ঘনিষ্ঠ পরিচয় ছিল। 'অশোক' নাটক লেখার সময় তিনি হরিনাথের বাহির মির্জাপুর রোডের বাড়িতে আসতেন। অশোক সম্পর্কিত মূল্যবান্ ঐতিহাসিক তথ্য জানাই ছিল তাঁর উদ্দেশ্য। এ বিষয়ে হরিনাথের সহায়তা ছিল খুবই স্বাভাবিক। কেননা তিনি ছিলেন গিরিশ-চন্দ্রের লেখার একজন গুণমুগ্ধ পাঠক। গিরিশচন্দ্র সম্পর্কে কুমুদবন্ধু সেনের গ্রন্থে এ সম্পর্কে কিছু কৌতূহলকর বিবরণ আছে।

বৌদ্ধদর্শনের ওপর এক মূল্যবান্ গ্রন্থের লেখক ইয়ামাকামি সোগেনের কথা আগেই উল্লেখ করা হয়েছে। বৌদ্ধশাস্ত্র সম্পর্কে তাঁর ইংরেজীতে লেখা প্রকাণ্ড গ্রন্থরচনায় হরিনাথের বিপুল সহায়তা ছিল। হরিনাথের মৃত্যুর পর প্রকাশিত এই গ্রন্থের ভূমিকায় লেখক সেকথা সশ্রদ্ধচিত্তে স্বীকার করেছেন।

সরকারী চাকরির দায়দায়িত্ব এবং কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাষা ও সাহিত্য বিভাগের প্রায় সমস্ত গুরুত্বপূর্ণ কার্যভারে সমানে যুক্ত থাকা সত্ত্বেও হরিনাথ এই ধরনের-অনেক গবেষণায় সাগ্রহে সক্রিয় সহযোগিতা করেছেন। তিনি নিজেও এই সময় বহু মূল্যবান্ গবেষণার কাজে ব্যাপৃত ছিলেন। হরিনাথের এই সদাপ্রস্তুত সহৃদয়তা অনেক সময় তাঁর নিজের গবেষণার ক্ষেত্রে বাধাস্বরূপ হয়েছে। তৎসত্ত্বেও এই সহায়তার বিষয়ে তিনি অবিচল ছিলেন। অসাধারণ বিদ্যার সঙ্গে স্বভাবসিদ্ধ মহানুভবতার এমন বিস্ময়কর মিলন সর্বদেশে এবং সর্বকালেই বিরল।

রচনাসম্ভার

ইতিপূর্বেই বলা হয়েছে যে ছাত্রদের সুবিধার জন্য হরিনাথ ইংরেজী সাহিত্যের কয়েকখানি পাঠ্যপুস্তকের নূতন সম্পাদিত সংস্করণ প্রকাশ করেন। আর শুধুমাত্র এই সম্পাদনার কাজই নয়, ঢাকা কলেজে অধ্যাপনা করার সময় থেকেই তিনি নানাবিধ গবেষণায় ব্যাপৃত হন। 1903 খ্রীস্টাব্দের 14 জুন তিনি রাখালদাস হালদারের লেখা ইংল্যান্ডের ডায়েরির (*The English Diary of an Indian Student*, 1861-62) এক মূল্যবান্ ভূমিকা লিখে দেন। হরিনাথের লেখা প্রায় সাতাশ পৃষ্ঠার এই ভূমিকায় রাখালদাসের জীবন ও কর্মের তথ্যপূর্ণ বৃত্তান্ত পাওয়া যায়। রাখালদাস সরকারী চাকরিতে নিযুক্ত ছিলেন। তাছাড়া তাঁর স্বাস্থ্য মোটেই ভাল ছিল না। কিন্তু তৎসত্ত্বেও বিদ্যাচর্চায় তাঁর যথেষ্ট আগ্রহ ছিল। জাতিতত্ত্ব ও মুণ্ডারী ভাষা সম্পর্কে তাঁর আলোচনা প্রশংসনীয়। সর্বোপরি রক্ষণশীল আত্মীয়স্বজনদের প্রবল বাধাকে উপেক্ষা করেই রাখালদাস ইংল্যান্ডে যান (11 এপ্রিল 1861)। তিনি সেখানে বহু গুণিজনের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন। এই চোদ্দ মাসের ইংল্যান্ড্-ভ্রমণে তাঁর নানা অভিজ্ঞতার সাক্ষ্য বর্তমান। রচনাশৈলী একটু এলোমেলো হলেও তাঁর এই ডায়েরী ঐতিহাসিক কারণে গুরুত্বপূর্ণ। তাই তাঁর সম্পর্কে হরিনাথের শ্রদ্ধান্বিত হওয়াই তো স্বাভাবিক।

হরিনাথের ঢাকা কলেজে অধ্যাপনাকালে ভারতের বড়লাট লর্ড কার্জন ঢাকা পরিদর্শনে যান। এই সূত্রে 1904 খ্রীস্টাব্দের 18 ফেব্রুয়ারি তিনি আবু আব্‌দুল্লাহ্ মুহম্মদ ইবন্ বতুতা (Abu Abdullah Muhammad ibn Batuta,-র "বাংলাদেশের বিবরণ" এবং সমসুদ্দীন মুহম্মদ হাফিজ (Shams-al-Din Muhammad Hafiz)-র "সুলতান গিয়াসুদ্দীনের উদ্দেশে একটি গীতিকবিতা" (যথাক্রমে মূল আরবী ও পারসীক রচনাসহ) ইংরেজীতে অনুবাদ করেন। হরিনাথ অনূদিত এই রচনা দুটি এক পুস্তিকাকারে (*Miscellanea*) প্রকাশিত হয়। এই পুস্তিকাটি লর্ড কার্জনকে উৎসর্গ করেন। হরিনাথ এই পুস্তিকার উৎসর্গপত্রটি লাতিন ভাষায় লেখেন। একথা পূর্বেই বলা হয়েছে। ইবন্ বতুতার ভ্রমণবৃত্তান্ত থেকে যে অংশের তিনি অনুবাদ করেছেন তাতে আমরা বাংলাদেশের চতুর্দশ শতকের কৃষিসম্পদ, গোসম্পদ এবং অন্যান্য গৃহপালিত জীবজন্তু ও পশুপক্ষীর এক মনোহর বিবরণ পাই। এছাড়া বহু বিচিত্র বিষয়ে বৃত্তান্তটি পরিপূর্ণ। বাংলাদেশের পণ্যদ্রব্যের প্রাচুর্য এবং প্রাকৃতিক শোভা

ইবন্ বতুতাকে মুগ্ধ করেছিল। এদেশের মধ্যযুগের ইতিহাস সম্পর্কে উৎসুক পাঠক ও গবেষকের কাছে আজও এই ভ্রমণবৃত্তান্ত মূল্যবান। তরুণ বয়সে হরিনাথ এই অনুবাদের কাজে হাত দিয়ে যথেষ্ট দুঃসাহসের পরিচয় দেন। যে কোন ভাষার এই রকম রচনা অনেক সময়েই অনুবাদককে বিভ্রান্ত করে তোলে। ইবন্ বতুতার অনুবাদে এটি হল এক দুরূহ সমস্যা। অসাধারণ পাণ্ডিত্য পরিশ্রম ও নিষ্ঠায় হরিনাথ এই বাধাগুলি অতিক্রমের চেষ্টা করেছেন। তাঁর এই অনুবাদের সঙ্গে যেসব টীকা যুক্ত হয়েছে সেগুলিও খুব গুরুত্বপূর্ণ। হাফিজের অনুবাদটি বিশেষ উল্লেখযোগ্য। কেননা এই কবিতা সম্পর্কে যেসব জটিলতা বিভিন্ন অনুবাদক ও টীকাকারকে এতকাল বিব্রত করেছে, হরিনাথ সে বিষয়ে এক চমৎকার সমাধানে উদ্যোগী হয়েছেন। এছাড়া এই অনুবাদের সঙ্গে তিনি সংযুক্ত করেন রিট্যর্ ফন্ রোজেনট্স্‌ভাইশ্-শ্‌ভানাউ (Ritter von Rosenzweig-Schwannau)-এর টীকাসহ জার্মান ভাষান্তর এবং তাঁর স্বকৃত ইংরেজী তরজমা। পরবর্তীকালে এক বিখ্যাত পণ্ডিত হরিনাথের এই পুস্তিকাটিকে বিস্মৃতির কবল থেকে রক্ষা করার বিষয়ে অভিমত জানান। অনেককাল পরে বর্তমান জীবনীকারের চেষ্টায় হরিনাথ কৃত ইবন্ বতুতার এই অনুবাদ কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাচীন ভারতীয় ইতিহাস বিভাগের 'জার্নাল' (1971-72)-এ পুনর্মুদ্রিত হয়েছে।

কলকাতার মুসলিম ইনস্টিটিউটের মুখপত্র 'জার্নাল অভ্ দি মুসলিম ইন্‌স্টিটিউট' (জুলাই-সেপ্টেম্বর 1905)-এ হরিনাথ প্রকাশ করেন কা'ব (K'ab)-এর সেই সুবিখ্যাত গীতিকবিতার ছন্দোবদ্ধ ইংরেজী অনুবাদ। ভূমিকা ও টীকাসহ তাঁর এই অনুবাদ ("Metrical Version of Bānat Su'ad") এদেশে আরবী কাব্যচর্চার ধারায় এক উল্লেখযোগ্য অবদান। দেশবিদেশের বিভিন্ন পত্রপত্রিকায় তাঁর এই অনুবাদকর্ম প্রশংসিত হয়। পরবর্তীকালে এই কবিতাটি রেনল্ড এ. নিক্‌ল্‌সন্ (Renold A. Nicholson) ইংরেজীতে অনুবাদ করেছেন। এই দুই অনুবাদের তুলনামূলক বিচারে হরিনাথের নৈপুণ্য সুস্পষ্ট। হরিনাথ তাঁর অনুবাদে আব্দুল মালিক ইবন্ হিসাম (Abdul Malik ibn Hisham) সংকলিত মূলপাঠই অনুসরণ করেন। আর তাঁর সংক্ষিপ্ত ভূমিকায় তিনি এই কবিতারচনার বিস্ময়কর ইতিহাসও বর্ণনা করেছেন। মুসলিম ইনস্টিটিউটের 'জার্নাল'-এর পরের সংখ্যায় (অক্টোবর-ডিসেম্বর 1905) তিনি কুলসূম ইবন্ ওমর অল্-অতাবী (Kulthum ibn Omar al-Atabi', আহ্‌মদ ইবন অল্-হুসেন অল্-মুতনব্বী (Ahmed ibn al-Hussain al-Mutanabbi), ইমরাউল কায়স (Imraul-Qais), অল-ওয়ালীদ বিন্ আবদুল মালিক (Al-Walidbin Abd-ul-Malik), ইয়াজিদ বিন্ মু'আবিয়া (Yazid bin Mu'awiyeh) প্রমুখ বিখ্যাত আরবী কবির তেরটি চমকপ্রদ কবিতার ইংরেজী অনুবাদ করেন। তাঁর এই ছন্দোবদ্ধ অনুবাদ ("Translations from Arabic Poetry") পণ্ডিতদের প্রশংসা

পায়। আর এই সংখ্যায় কবিতার ছন্দোবদ্ধ অনুবাদ ছাড়া তিনি মন্মথনাথ রায়চৌধুরী এবং দেবেন্দ্রচন্দ্র মল্লিক অনূদিত বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের 'চন্দ্রশেখর' উপন্যাসের দুটি ইংরেজী তরজমা সম্পর্কে এক সুষ্ঠু সমালোচনা লেখেন। শুধু তাই নয়, এই সংখ্যার বিশেষ ক্রোড়পত্রে তিনি মৌলবী রজা আলি ওয়াশত রচিত একটি পারসীক গীতি-কবিতার ছন্দোবদ্ধ ইংরেজী অনুবাদও করেন। পূর্বোক্ত 'জার্নাল'-এর পরবর্তী সংখ্যায় (জানুয়ারী-মার্চ 1906) তিনি প্রকাশ করলেন পঙ্কজিনী বসু ও রানী মৃণালিনীর যথাক্রমে "সূর্যমুখী" ও "ডেকেছি কেন?" কবিতার ছন্দোবদ্ধ ইংরেজী অনুবাদ। ঢাকা কলেজে অধ্যাপনাকালেই তিনি পঙ্কজিনীর "সূর্যমুখী" কবিতাটির অনুবাদ করেন (5 মে 1902)। কিন্তু এই পরিমার্জিত অনুবাদের সঙ্গে তিনি যুক্ত করলেন এক মূল্যবান্ টীকা। তাঁর টীকা থেকে জানা যায়, পঙ্কজিনীর উক্ত কবিতার সঙ্গে সতের শতকের স্পেনীয় সাহিত্যের মহান্ লেখক পেদ্রো কাল্দেরোন দে লা বারকা (Pedro Calderon de la Barka)-র 'বিস্ময়কর জাদুকর' নামক নাটকের একটি অংশের আশ্চর্য সাদৃশ্য। সুতরাং তাঁর এই অনুবাদ ("Translations from the Poetesses of Bengal") আমাদের অনুবাদচর্চার ইতিহাসে এক উল্লেখযোগ্য সংযোজন। সর্বোপরি এই সংখ্যায় তিনি পুনরায় দেবেন্দ্রচন্দ্র অনূদিত 'চন্দ্রশেখর' সম্পর্কে এক বিস্তৃত সমালোচনা লেখেন। দেবেন্দ্রচন্দ্রের অসংখ্য ত্রুটিবিচ্যুতি দেখানোর পর হরিনাথ সুষ্ঠু অনুবাদের দৃষ্টান্ত হিসাবে নিজেই 'চন্দ্রশেখর'-এর একটি অংশের ইংরেজী তরজমা করেন।

ইতিমধ্যে হরিনাথ রীতিমত এক দুঃসাহসিক কাজ করেছেন। কলকাতা থেকে প্রকাশিত বিখ্যাত 'ইণ্ডিয়ান্ মিরর্' (11 নভেম্বর, 1905) সংবাদপত্রে তিনি বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের 'আনন্দমঠ' উপন্যাসের কিছু গুরুত্বপূর্ণ অংশসহ "বন্দেমাতরম্" সঙ্গীতটির সঠিক ইংরেজী অনুবাদ প্রকাশ করেন। এই অনুবাদ প্রকাশের মধ্যে তাঁর চরিত্রের একটি বিশেষ দিক্ আমাদের কাছে স্পষ্ট হয়ে ওঠে। তাঁর চরিত্রেই সেই দিকটি হল গভীর স্বদেশপ্রেম। ভারত সরকারের শিক্ষাবিভাগের উচ্চ পদে নিযুক্ত থেকে সরকারী নির্দেশ অমান্য করার সাহস একমাত্র হরিনাথের মত দুর্লভ মানুষের পক্ষেই সম্ভব। কেননা সে সময় সরকারী নির্দেশ অনুসারে "বন্দেমাতরম্" সঙ্গীতটির শুধু উচ্চারণই রাজদ্রোহের অপরাধে অভিযুক্ত হওয়ার ক্ষেত্রে যথেষ্ট ছিল। আর হরিনাথ শুধুমাত্র এই সঙ্গীতটির অনুবাদ করেই ক্ষান্ত হননি। 'আনন্দমঠ'-এর দশম অধ্যায়ের শুরুতে এই সঙ্গীতের যে গুরুত্ব ও ভাবার্থ প্রকাশিত, হরিনাথ সেই অংশেরও স্বচ্ছন্দ অনুবাদ করেছেন। স্বদেশের রাজনৈতিক আন্দোলনের সঙ্গে হরিনাথ প্রত্যক্ষভাবে যুক্ত ছিলেন না। কিন্তু তাঁর এই দুঃসাহসিক অনুবাদকর্ম নিঃসন্দেহে প্রমাণ করে যে স্বদেশী আন্দোলনে তাঁর আন্তরিক সমর্থন ছিল।

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে এই সময় হরিনাথ লাতিন ভাষাতেও "বন্দেমাতরম্"-এর ছন্দোবদ্ধ অনুবাদ করেন। তাঁর এই লাতিন অনুবাদ অরুণ সেন ও প্রফুল্লচন্দ্র ঘোষ পড়েন। হরিনাথের ছাত্র ব্যারিস্টার সেন এই অনুবাদ পড়ে মুগ্ধ হন। কেননা আশি বছর বয়সে তিনি তাঁর স্মৃতি থেকে স্বচ্ছন্দে এই লাতিন অনুবাদের কয়েক পঙ্‌ক্তি বর্তমান জীবনীকারকে আবৃত্তি করে শোনান। আর প্রফুল্লচন্দ্র এই লাতিন অনুবাদটি শুধুমাত্র নিজেই পড়েননি, একজন গুণী ইংরেজকে অনুবাদটি পড়তে দেন। প্রফুল্লচন্দ্র তখন হাওড়ার ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট ছিলেন। আর সে সময় হাওড়ার ম্যাজিস্ট্রেট ছিলেন এ ডব্লিউ. কুক্ (A. W. Cook)। লাতিন ও গ্রীক ভাষায় কুক্ সাহেবের দক্ষতা ছিল। কেননা তিনি ছিলেন অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের কৃতী ছাত্র। হরিনাথের এই লাতিন অনুবাদ পড়ে তিনি চেয়ার থেকে লাফিয়ে ওঠেন। তিনি সরাসরিই প্রফুল্লচন্দ্রকে জিজ্ঞাসা করেন: 'তুমি সত্যই বলছ এই লাতিন একজন ভারতীয়ের লেখা? আমি তো কিছুতেই বিশ্বাস করতে পারছি না।'

এই সময় হরিনাথ আরও অনেক গুরুত্বপূর্ণ গবেষণায় ব্যাপৃত ছিলেন। টমাস্ উইলিয়ম্ রীস্ ডেভিড্‌স্ সম্পাদিত বিখ্যাত 'জার্নাল অভ্ দি পালি টেক্সট্ সোসাইটি' (1906-1907)-তে তাঁর কিছু মূল্যবান্ টীকা প্রকাশিত হয়। তাঁর এই টীকার ("Notes") প্রথম অংশের বিষয় পাণিনি ও বুদ্ধঘোষের কাল। বিভিন্ন নির্ভরযোগ্য তথ্যের সূত্র ধরে হরিনাথ এ বিষয়ে স্পষ্টতই লিখেছেন, পাণিনি ছিলেন বুদ্ধঘোষের অগ্রগামী; এবং রিখার্ট ফন্ পিশেলের মতন যেসব পণ্ডিতেরা তাঁদের লেখায় এই ব্যাকরণকারকে ষষ্ঠ অথবা সপ্তম শতকের মানুষ হিসাবে উল্লেখ করেছেন তাঁদের সিদ্ধান্ত ত্রুটিপূর্ণ। হরিনাথের এই আলোচনার দ্বিতীয় ভাগের বিষয় 'লঙ্কারো' শব্দটির ব্যাখ্যা। কেমব্রিজ্ বিশ্ববিদ্যালয় প্রকাশিত জাতকের অনুবাদে (দ্বিতীয় খণ্ড) ডব্লিউ. ডি. রাউস্ (W. D. Rouse) এই বিশিষ্টার্থক শব্দটি সম্পর্কে নিজের অজ্ঞতা জানিয়ে এড্‌ওয়ার্ড বাইলস্ কাউএলের অভিমত উল্লেখ করেন। কাউএল্ সাহেবের মতে শব্দটির অর্থ 'নঙ্গর'। কিন্তু হরিনাথ তাঁর এই শ্রদ্ধেয় শিক্ষকের প্রতি যথেষ্ট শ্রদ্ধা জানিয়ে সবিনয়ে লেখেন, এই পালি শব্দটির প্রকৃত অর্থ 'পাল'। প্রমাণ হিসাবে এ বিষয়ে তিনি বুদ্ধ-ঘোষের 'বিশুদ্ধিমার্গ'-এর বর্মী সংস্করণ থেকে একটি নির্ভরযোগ্য অংশের উদ্ধৃতি দেন। এই টীকার শেষ ভাগটি সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ শান্তিদেবের 'বোধিচর্যাবতার' সম্পর্কে প্রজ্ঞাকরমতি এক মূল্যবান্ ভাষ্য লেখেন। প্রজ্ঞাকরমতির ভাষ্যের একটি অংশের হরিনাথ ব্যাখ্যা করেছেন এই ভাগে। অজেন বুর্নুফ (Eugene Burnout), ইওহান হেন্‌ড্রিক কাস্‌পের কের্ন্ (Johann Hendrik Kasper Kern) প্রমুখ প্রখ্যাত ইওরোপীয় পণ্ডিতেরা এ বিষয়ে যেসব ভিন্ন ব্যাখ্যা করেছিলেন হরিনাথ সে সম্পর্কে এক সুষ্ঠু সমাধানের চেষ্টা করেন। বৌদ্ধশাস্ত্রের এই জটিল ব্যাখ্যায় হরিনাথ যথার্থই

পণ্ডিতের সম্মান-অধিকারী। এ বিষয়ে হরিনাথের পাণ্ডিত্যের উচ্চ প্রশংসা করেছেন ইয়ামাকামি সোগেন।

1907 খ্রীস্টাব্দের 28 মার্চ হরিনাথ ভূমিকাসহ কালিদাসের 'অভিজ্ঞান-শকুন্তল'-এর প্রথম দুটি অঙ্কের ছন্দোবদ্ধ ইংরেজী অনুবাদ পুস্তকাকারে প্রকাশ করেন। তাঁর পাণ্ডিত্যপূর্ণ ভূমিকা থেকে জানা যায় যে ইংরেজীতে শকুন্তলার সুষ্ঠু ও নির্ভরযোগ্য অনুবাদের অভাব অনুভব করেই তিনি এই কাজে হাত দেন। তাঁর মতে শকুন্তলা একখানি গীতধর্মী নাটক। এই সংস্কৃত নাটকের সঙ্গে তিনি ইতালীয় ভাষায় লেখা তোর্‌কোআতো তাস্‌সো (Torquato Tasso)-র 'আমিন্‌তা' এবং জোভান্নি বাত্তিস্‌তা গুআরিনি' (Giovanni Battista Guarini)-র 'বিশ্বস্ত মেষচারক' নামক নাটক দুটির চমৎকার সাদৃশ্য লক্ষ্য করেছেন। এই সাদৃশ্য হরিনাথের পূর্ববর্তী কোন অনুবাদকদের চোখে পড়েনি। সংস্কৃত ভাষা ও সাহিত্যে সুপণ্ডিত উইলিয়ম্ মনিয়র-উইলিয়মস্ (William Monier-Williams)-এর জনপ্রিয় অনুবাদেও ছিল কিছু ভুলভ্রান্তি। বিভিন্ন ইওরোপীয় ভাষায় প্রকাশিত শকুন্তলা-অনুবাদের এক তুলনামূলক আলোচনা হরিনাথের এই ভূমিকার আর একটি বৈশিষ্ট্য। তাঁর মতে এ বিষয়ে লুড্‌ভিক্ ফ্রিট্‌সে (Ludwig Fritze)-র জার্মান ভাষান্তরই শ্রেষ্ঠ। যদিও তিনি নিজে অবশ্য অনেক ক্ষেত্রে এই জার্মান অনুবাদকের সঙ্গে একমত নন। হরিনাথ তাঁর এই অনুবাদে রিখার্ট ফন্ পিশেল সংকলিত শকুন্তলার মূলপাঠ অনুসরণ করেছেন। কেননা তাঁর মতে এই পাঠই নির্ভরযোগ্য। অবশ্য কোনো কোনো স্থানে তিনি পিশেল্ সম্পাদিত পাঠের সংশোধন করেছেন। হরিনাথের অনুবাদসংলগ্ন টীকাগুলিও অত্যন্ত মূল্যবান্। এই টীকাগুলিতে তিনি পৃথিবীর বিভিন্ন সাহিত্য ও সংস্কৃতির সঙ্গে কালিদাস সাহিত্যের এক সুচিন্তিত যোগসূত্র দেখিয়েছেন।

এই বছরের এপ্রিল হরিনাথ কলকাতার এশিয়াটিক সোসাইটির সাধারণ অধিবেশনে পারসীক ভাষায় লেখা নবাব নস্রৎ জঙ্গের ঢাকার ইতিহাস (*Tarikh-i-Nusratjangi*) সম্পর্কে একটি প্রবন্ধ পাঠ করেন। পরের বছরেই তাঁর সম্পাদনায় এই মূল্যবান্ গ্রন্থটি প্রকাশিত হয়। 1817 খ্রীস্টাব্দের পূর্বেই ঢাকার নবাব কর্তৃক এই চমকপ্রদ ইতিহাস লিখিত হয়। তাঁর মৃত্যুর পর সৈয়দ আবদুল গণীর সহায়তায় এই গ্রন্থে উনিশ শতকের মধ্যভাগের ইতিহাসও সংযুক্ত হয়। এই গ্রন্থের সম্পাদনার কাজে হরিনাথ তিনটি পারসীক পাণ্ডুলিপি ব্যবহার করেন। এশিয়াটিক সোসাইটিতে রক্ষিত পাণ্ডুলিপিটি ব্যতীত অন্য দুটি পাণ্ডুলিপিই ছিল তাঁর বন্ধু ও ছাত্রের নিজস্ব সংগ্রহের। এই গ্রন্থটি তিনি জেমস্ টম্‌সন্ র‍্যাংকিন্ (James Thomson Rankin)-কে উৎসর্গ করেন। কেননা র‍্যাংকিন্ সাহেবের উৎসাহ ও আগ্রহেই তিনি এই গবেষণায় ব্যাপৃত হন। সর্বোপরি ঢাকা সম্পর্কে এই ইংরেজ পণ্ডিতের মতন

বিশেষজ্ঞ তাঁর কালে বিশেষ ছিল না। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে ঐতিহাসিক টীকাসহ এই পারসীক রচনার অনুবাদেরও ইচ্ছা হরিনাথের ছিল। এশিয়াটিক সোসাইটির বার্ষিক অধিবেশনে (1908) আশুতোষ মুখোপাধ্যায় এই কাজে হরিনাথের অতুলনীয় ভাষা-তাত্ত্বিক জ্ঞানের উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করেন।

1907 খ্রীস্টাব্দের 6 নভেম্বর হরিনাথ কলকাতার এশিয়াটিক সোসাইটির সাধারণ অধিবেশনে উর্দু ও পারসীক ভাষায় লেখা বিতর্কমূলক কয়েকটি পুস্তিকার রফি অল্-কুলি কৃত আরবী অনুবাদ (An Arabic Translation of Controversial Pamphlets in Urdu and Persian by Rafi al-Khuli) সম্পর্কে এক মূল্যবান্ রচনা পাঠ করেন। রফি অল-কুলির এই আরবী অনুবাদও হরিনাথের সম্পাদনায় প্রকাশিত হওয়ার ব্যবস্থা হয়েছিল। এশিয়াটিক সোসাইটি এই গ্রন্থ মুদ্রণের বিজ্ঞপ্তিও স্বভাবতই প্রচার করেছিল। কিন্তু ছাপাখানা থেকে মুদ্রিত হয়ে এই গ্রন্থ শেষ পর্যন্ত প্রকাশিত হয়নি।

1908 খ্রীস্টাব্দের 5 ফেব্রুয়ারি হরিনাথ এই এশিয়াটিক সোসাইটির সাধারণ অধিবেশনে তাজমহলের স্থপতিদের ("The Builders of the Taj) সম্পর্কে আর এক উল্লেখযোগ্য রচনা পাঠ করেন। বলা বাহুল্য, ঐসলামিক স্থাপত্যের এক বিস্ময়কর নিদর্শন এই তাজ। দুটি পারসীক ও একটি উর্দু পাণ্ডুলিপির ওপর ভিত্তি করে এবং বহু অনুসন্ধানের মাধ্যমে তিনি তাজনির্মাণ সম্পর্কিত ইতিহাসের এক উপেক্ষিত দিকে আলোকপাত করলেন। এই দিকটি হল তাজনির্মাণে মেহনতী মানুষের ভূমিকা। তাজের নির্মাণ কার্যে বিভিন্ন শ্রেণীর মজুরের সংখ্যা, তাদের কর্মরত দিনের হিসাব, মজুরী—এইসব তাৎপর্যপূর্ণ বিষয়ের বিবরণী হরিনাথের গবেষণায় পাওয়া যায়। এছাড়া তাজনির্মাণের নানাবিধ উপকরণ সম্বন্ধেও অনেক তথ্য মেলে। যেমন তাজের গায়ে যেসব রত্ন খোদাই করা ছিল তাদের নাম, ওজন প্রভৃতি বিষয়ে এক পুঙ্খানুপুঙ্খ পরিচয় আমরা এখানে পাই। হরিনাথের এই গবেষণা থেকে জানা যায় যে তাজ-নির্মাণে ব্যয় হয়েছিল চার কোটি আঠার লক্ষ চার হাজার ছাব্বিশ টাকা সাতচল্লিশ পয়সা। তাঁর এই রচনাটি এশিয়াটিক সোসাইটির 'জার্নাল'-এর পরবর্তী কোনো সংখ্যায় প্রকাশিত হওয়া প্রত্যাশিত ছিল। কিন্তু কোন অজ্ঞাত কারণে তা প্রকাশিত হয়নি।

এই বছরের পয়লা এপ্রিল হরিনাথ পুনরায় এশিয়াটিক সোসাইটি সাধারণ অধিবেশনে তাজ, মতি মসজিদ, আগ্রার দুর্গ ও ফতেপুর সীক্রির নির্মাণকার্য ("An Account of the construction of (1) the Taj, (2) the Moti Masjid, (3) the Agra fort, and (4) Fatehpur Sikri) সম্পর্কে একটি রচনা পাঠ করেন। বলা বাহুল্য, মুসলিম স্থাপত্যের এই গুরুত্বপূর্ণ দিক সম্পর্কে তাঁর আগ্রহ ও উৎসাহ উল্লেখযোগ্য।

এই সময় হরিনাথ পালি ভাষা থেকে 'সুত্তনিপাত'-এর দ্বিতীয় সূত্র "ধনিয়সুত্ত"-র এক ছন্দোবদ্ধ ইংরেজী অনুবাদ করেন। প্রাচীন ভারতীয় কাব্যসাহিত্যের উৎকৃষ্ট নিদর্শন হিসাবে এই অনুবাদকর্ম মূল্যবান্। সর্বোপরি কাব্যসম্পদ ছাড়া বুদ্ধ এবং গোপালক ধনিয়ের মধ্যে এই কথোপকথনে বৌদ্ধ ভারতবর্ষের সামাজিক, ধর্মীয় ও আর্থনীতিক অবস্থা সুস্পষ্ট। হরিনাথের এই অনুবাদে আকর্ষণের চমকপ্রদ ইতিহাস ইতিপূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে। পালিতে তাঁর এম্. এ. পরীক্ষার সময় ষষ্ঠপত্রে সংবলিত ধনিয়সুত্তের অংশবিশেষের স্বচ্ছন্দে ছন্দোবদ্ধ ইংরেজী অনুবাদই তিনি লেখেন উত্তরপত্রে। পরীক্ষার ফল প্রকাশের পর তিনি এই অনুবাদ সম্পর্কে স্বভাবতই আগ্রহী হন। আর তিনি অনুবাদটিকে সম্পূর্ণ করে প্রকাশ করেন।

প্রাচ্যবিদ্‌দের আন্তর্জাতিক সম্মিলনের পঞ্চদশ অধিবেশনে (14-20 আগস্ট 1908) অনুষ্ঠিত হয় কোপেনহেগেনে। হরিনাথ এই সম্মিলনে সুবন্ধুর কাল ("The Date of Subandhu") বিষয়ে একটি প্রবন্ধ পাঠান। জর্জ তিবো উক্ত সম্মিলনে হরিনাথের এই রচনাটি পাঠ করেন। বিখ্যাত সংস্কৃত গদ্যকাব্য 'বাসবদত্তা'-র লেখক সুবন্ধুর কাল আজও আমাদের কাছে অজানা; হরিনাথের এই আলোচনা তাই খুব মূল্যবান্।

1909 খ্রীস্টাব্দের 15 মার্চ রাজেন্দ্রনাথ বিদ্যাভূষণের সুপরিচিত 'কালিদাস' (1315 বঙ্গাব্দ) গ্রন্থের হরিনাথ একটি ভূমিকা লিখে দেন। ইংরেজীতে লেখা এই ভূমিকায় তিনি কালিদাস সম্পর্কে এশিয়া ও ইওরোপের বিভিন্ন ভাষায় প্রকাশিত রচনার এক চমকপ্রদ আলোচনা করেছেন। সর্বোপরি কালিদাসের কাল ও রচনাবলী বিষয়ে তাঁর বক্তব্যও মূল্যবান্। রাজেন্দ্রনাথ তাঁর উক্ত গ্রন্থের শুরুতে হরিনাথ সম্পর্কে যে মন্তব্য করেছেন তা প্রসঙ্গক্রমে উল্লেখ করা যায়ঃ "কলিকাতা ইম্পীরিয়াল লাইব্রেরীর অধ্যক্ষ, অশেষ-ভাষাবিৎ ভুবনবিখ্যাত, মাননীয় মনস্বী শ্রীযুক্ত হরিনাথ দে, এম. এ, মহোদয়, অনুগ্রহপূর্বক আমার এই নিষ্কিঞ্চন গ্রন্থের ভূমিকা লিখিয়া দিয়া আমাকে গৌরবিত ও অপরিশোধ্য ঋণে আবদ্ধ করিয়াছেন। কঠিন পর্বত-গাত্রে কুসুমিত লতিকার ন্যায়, আমার এই নীরস গ্রন্থের পক্ষে শ্রীযুক্ত দে মহোদয়ের লিখিত এই ভূমিকা সুন্দর অলঙ্কার-স্বরূপ। শ্রীযুক্ত দে মহোদয়, তদীয় প্রকৃতিসিদ্ধ মহানুভবতা গুণে আমার ধন্যবাদটি পর্যন্ত গ্রহণ করিতে লজ্জিত।..."

হরিনাথের এক অপ্রকাশিত পাণ্ডুলিপি থেকে জানা যায় যে এই বছরের 30 জুন তিনি সুবন্ধুর 'বাসবদত্তা' র ইংরেজী অনুবাদ সম্পূর্ণ করেন। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে ইতি-পূর্বে এই জটিল গদ্যকাব্য কোনো ভাষাতেই অনূদিত হয়নি। হরিনাথ স্বভাবতই এ বিষয়ে পথিকৃৎ। চারটি অপ্রকাশিত ও একটি প্রকাশিত টীকা ঘাঁটিয়া তিনি এই অনুবাদ সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করেন। 1909 খ্রীস্টাব্দের 7 জুলাই তিনি কলকাতার এশিয়াটিক সোসাইটির সাধারণ অধিবেশনে এ বিষয়ে একটি প্রবন্ধ পাঠ করেন।

এশিয়াটিক সোসাইটির 'জার্নাল'-এ তাঁর এই রচনাটি প্রকাশিত হবার কথা ছিল। কিন্তু শেষ পর্যন্ত তা প্রকাশিত হয়নি।

1909 খ্রীস্টাব্দেই হরিনাথ 'নির্বাণব্যাখ্যানশাস্ত্রম্' সম্পাদনা করেন। বলা বাহুল্য, বৌদ্ধদর্শনের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় এই নির্বাণ। হরিনাথের এই সুষ্ঠু সংস্করণে বিভিন্ন তীর্থংকর প্রবর্তিত কুড়ি প্রকারের নির্বাণ এবং তদনুসারী সম্প্রদায় সম্পর্কে চমকপ্রদ বিশ্লেষণ আছে। পরবর্তীকালে সংস্কৃত ভাষায় সুপণ্ডিত যতীন্দ্রবিমল চৌধুরী এক আলোচনায় হরিনাথের এই সম্পাদনার খুব সুখ্যাতি করেন।

এই একই বছরে হরিনাথ 'লঙ্কাবতারসূত্র' সম্পাদনার কাজও সম্পন্ন করলেন। 'লঙ্কাবতারসূত্র' বৌদ্ধদর্শনের আদি ইতিহাসের অন্যতম নির্ভরযোগ্য গ্রন্থ হিসাবে প্রসিদ্ধ এবং স্বভাবতই মূল্যবান্। এই মহাযান গ্রন্থের রচনাকাল 343 থেকে 393 খ্রীস্টাব্দের মধ্যে স্থির করাই যুক্তিযুক্ত। হরিনাথ তাঁর এই সংস্করণে কুড়িটি বিভিন্ন সূত্র নির্বাচন করেছেন। বিখ্যাত পণ্ডিত হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর মতে হরিনাথের সম্পাদিত এই গ্রন্থ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

1909 খ্রীস্টাব্দের 3 নভেম্বর হরিনাথ এশিয়াটিক সোসাইটির সাধারণ অধিবেশনে তাঁর এক বন্ধুর মৃত্যুতে একটি শোকবার্তা পাঠ করেন। তাঁর এই রচনাটি খুব মূল্যবান্। এশিয়াটিক সোসাইটির 'জার্নাল'-এ তাঁর এই রচনাটি প্রকাশিত হয়। তাঁর এই রচনার বিষয় এর্নস্ট্ টেওডোর ব্লখের জীবন ও কর্মের বিবরণ। পূর্বেই বলা হয়েছে যে জার্মানীর এই বিখ্যাত পণ্ডিতের সঙ্গে হরিনাথের অন্তরঙ্গ বন্ধুত্ব ছিল। ব্লখ্ আজীবন যেসব গুরুত্বপূর্ণ গবেষণার কাজ করেছেন, সেগুলির তথ্যপূর্ণ বিবরণ এখানে আমরা পাই। এই বিখ্যাত পণ্ডিতের গবেষণার মূল ধারাটির বৈশিষ্ট্য হরিনাথের রচনায় সুস্পষ্ট। এই শোকবার্তাটি যথার্থই এক বিশেষজ্ঞের লেখা; শোক প্রকাশের তথাকথিত উচ্ছ্বাস এতে বিন্দুমাত্র নেই। ভাবালুতার পরিবর্তে যে সাধনায় ব্লখ্ নিজের শরীরকে তিলে তিলে ক্ষয় করেছিলেন তার স্বরূপ বিশ্লেষণ করা হয়েছে। ভারতের ইতিহাস ও অন্যান্য সমস্যাকীর্ণ বিষয়ে ব্লখের কৃতিত্বের পরিচয় এখানে অতি সরলভাবে আলোচিত হয়েছে। ব্লখের কৃতিত্বের এই আলোচনায় বহু বিষয়ে হরিনাথের নিজের পাণ্ডিত্যেরও পরিচয় পাওয়া যায়। এই আলোচনার শুরুতে তিনি ব্লখের জীবনের সাধারণ ঘটনাগুলি উল্লেখ করেন। তারপর তিনি ব্লখের গবেষণার প্রধান প্রধান দিকগুলির সংক্ষিপ্ত ও খাঁটি বিবরণ দিয়েছেন। প্রথমে তিনি আলোচনা করেছেন ভাষাচর্চায় এই পণ্ডিতের কৃতিত্বের দিকটি। ইংরেজী, জার্মান, ড্যানিশ, ডাচ, সুইডিশ, ইতালীয়, ফরাসী, স্পেনীয় প্রভৃতি দশটি ইওরোপীয় ভাষায় ব্লখের জ্ঞান ছিল। এছাড়া তিনি আরবী, আর্মানীয়, পারসীক, পালি, সংস্কৃত, বাংলা, হিন্দী, ওড়িয়া, মারাঠী প্রভৃতি প্রাচ্যভাষার চর্চা করেন। সংস্কৃত, পালি প্রভৃতি ভাষায় যে সমস্ত তাম্রলিপি ও মুদ্রা

উৎকীর্ণ আছে, সেগুলির পাঠোদ্ধারে ব্রথ্ অনেক সময় প্রায় পথিকৃতের কাজ করেছেন। শুধু তাই নয়, ইতিহাসের উপকরণ হিসাবে তাদের সঠিক স্থান নির্ধারণে ব্রথের কৃতিত্ব অনেকখানি। সংস্কৃত ও অন্যান্য ভাষায় তাঁর অসামান্য অধিকার সম্পর্কে হরিনাথ সুবিখ্যাত পণ্ডিত রিখার্ট ফন্ পিশেলের মন্তব্য উল্লেখ করেছেন

1910 খ্রীস্টাব্দের 5 জানুয়ারি এশিয়াটিক সোসাইটির সাধারণ অধিবেশনে হরিনাথ এক অপ্রকাশিত তিব্বতী-লাতিন শব্দকোষ (*"An Unpublished Tibetan-Latin Vocabulary"*) সম্পর্কে একটি প্রবন্ধ পাঠ করেন। দা ফানো (Da Fano) নামে জনৈক ইতালীয় সন্ত এই শব্দকোষ প্রণয়ন করেছিলেন (1714)। এশিয়াটিক সোসাইটির 'জার্নাল'-এর পরবর্তী কোনো সংখ্যায় হরিনাথের এই মূল্যবান রচনাটি প্রকাশনার প্রত্যাশা ছিল। কিন্তু শেষ পর্যন্ত তা আর প্রকাশিত হয়নি।

1911 খ্রীস্টাব্দের জানুয়ারি মাসে কৃষ্ণচন্দ্র ঘোষের সম্পাদনায় কলকাতা থেকে 'হেরাল্ড' নামে এক ইংরেজী মাসিকপত্র প্রকাশিত হয়। এই পত্রিকায় প্রকাশিত প্রায় সমস্ত গুরুত্বপূর্ণ রচনারই লেখক ছিলেন হরিনাথ। উক্ত পত্রিকার প্রথম সংখ্যায় তাঁর পাঁচটি রচনা প্রকাশিত হয়। তিনি চীনা ভাষা থেকে নাগার্জুনের বহুমূল্য গ্রন্থ 'মাধ্যমিক কারিকা'-র ষড়বিংশ অধ্যায়ের ইংরেজীতে অনুবাদ করেন। তাঁর এই অনুবাদে ("Nagarjuna's View of Nirvana") আর্যদেবের বিখ্যাত টীকাও সংযোজিত হয়। এই অনুবাদে তাঁর সহকারী ছিলেন জাপানের বিখ্যাত পণ্ডিত রেভারেণ্ড ইয়ামাকামি সোগেন। এছাড়া এই সংখ্যায় হরিনাথ তিব্বতী ভাষা থেকে তারনাথ (Taranatha)-এর 'ভারতে বৌদ্ধধর্মের ইতিহাস' নামে এক গুরুত্বপূর্ণ গ্রন্থের ধারাবাহিক অনুবাদ শুরু করেন। 1608 খ্রীস্টাব্দে লেখা তারনাথের এই গ্রন্থে অজাতশত্রু থেকে সেনরাজাদের কাল পর্যন্ত বিস্তৃত বিবরণ পাওয়া যায়। সর্বোপরি বৌদ্ধ প্রচারক, মতবাদ প্রভৃতি বিষয়ে গ্রন্থকারের নির্দেশ মূল্যবান্। অতএব হরিনাথের এই অনুবাদ ("Taranatha's History of Buddhism in India") নিঃসন্দেহে গুরুত্বপূর্ণ। এই অনুবাদে তিনি ফ্রানট্‌স্ আন্টোন্ শীফ্‌নর্ (Franz Anton Schietner) সম্পাদিত তারনাথের মূলপাঠ অনুসরণ করেন। 1868 খ্রীস্টাব্দে শীফ্‌নরের সুষ্ঠু সম্পাদনায় এই মূলপাঠ সংবলিত গ্রন্থটি প্রকাশিত হয়। শুধু তাই নয়, 'হেরাল্ড'-এর এই সংখ্যাতে হরিনাথ বাংলা সাহিত্যের মহান্ স্রষ্টা বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের 'কৃষ্ণকান্তের উইল' এবং 'মুচিরাম গুড়ের জীবনচরিত'-এর ইংরেজী অনুবাদ শুরু করলেন। এই একই সংখ্যায় তিনি ফরাসী ভাষা থেকে রনে গিল (René Ghil)-এর একটি কবিতার ছন্দোবদ্ধ ইংরেজী অনুবাদও প্রকাশ করেন।

'হেরাল্ড'-এর পরের সংখ্যায় (ফেব্রুয়ারি 1911)-এ প্রকাশিত হরিনাথের রচনা-তালিকাও বিচিত্র ও চমকপ্রদ। চীনা ভাষা থেকে তিনি এই সংখ্যায় আর্যদেবের

টীকাসহ 'মাধ্যমিক কারিকা'-র পঞ্চম পরিচ্ছেদের ইংরেজী অনুবাদ সম্পূর্ণ করেন। তাঁর এই অনুবাদ ("Nagarjuna's View as to Characteristics of the Being and Non-Being") অত্যন্ত মূল্যবান্। তিব্বতী ভাষা থেকে তারনাথের উল্লিখিত ইতিহাস গ্রন্থের এবং বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাস দুটির অনুবাদও তিনি চালিয়ে যান। এছাড়া এই সংখ্যায় তিনি বিদ্যাপতির চারটি প্রসিদ্ধ পদেরও ইংরেজীতে ছন্দোবদ্ধ অনুবাদ প্রকাশ করলেন। বিদ্যাপতির এই চারটি পদ হল যথাক্রমে "সখি কি পুছসি অনুভব মোয়," "অপরূপ পেখলু রামা" "গেলি কামিনী গজহু গামিনী" এবং "সজনী কো কহু আওব মধাই"। হরিনাথ কৃত এই প্রত্যেকটি পদের অনুবাদই অনবদ্য। আর আশ্চর্যের বিষয় হল এই একই সংখ্যায় তিনি রুশ ভাষা থেকে মিখাইল য়ুরেভিচ্ লের্মোনতভ (Mikhail Yurevich Lermontov)-এর একটি কবিতারও ইংরেজীতে ছন্দোবদ্ধ অনুবাদ করেন। সর্বোপরি কবিতাপ্রিয় পাঠককে তিনি এবার উপহার দিলেন নিজের লেখা চারটি বাংলা কবিতা এবং তৎসহ ছন্দোবদ্ধ ইংরেজী অনুবাদ।

'হেরাল্ড' পত্রিকার পরের সংখ্যায় (মার্চ 1911) হরিনাথের ছটি রচনা প্রকাশিত হয়। এই সংখ্যায় চীনা ভাষা থেকে তিনি আর্যদেবের টীকাসহ নাগার্জুনের 'মাধ্যমিক কারিকা'-র সপ্তবিংশ অধ্যায়ের অনুবাদ প্রকাশ করেন। ইয়ামাকামি সোগেনের সহ-যোগিতায় হরিনাথের এই অনুবাদও ("Nagarjuna's View of the Soul or the Atman") অত্যন্ত মূল্যবান্। এছাড়া পালি ভাষায় লেখা প্রসিদ্ধ গ্রন্থ 'থেরীগাথা' থেকে হরিনাথ এক কবিতার ইংরেজীতে ছন্দোবদ্ধ চমৎকার অনুবাদ করলেন। তাঁর কৃত এই অনুবাদের নাম "The Temptation of Subha"। বলা বাহুল্য, বৌদ্ধধর্মের আদর্শ ও আত্মসংযমের অপূর্ব নিদর্শন এই কবিতায় গ্রথিত। আশ্চর্য গীতিময়তার সঙ্গে এই কাব্যনাট্যের মর্মস্পর্শী পরিণতিতে পাঠক স্বভাবতই অভিভূত হন। এই একই সংখ্যায় তিনি বিদ্যাপতির একটি প্রসিদ্ধ পদ ("কবরী ভয়ে চামরি গিরি কন্দর") এবং সমকালীন সুখ্যাত একটি বাংলা গানের ("যদি পরাণে না জাগে আকুল পিয়াসা") ছন্দোবদ্ধ ইংরেজী অনুবাদ প্রকাশ করেন। আর রুশ ভাষা থেকে আলেক্সান্দর সের্গেইভিচ্ পুশ্কিন্ (Alexander Sergeyevich Pushkin)-এর একটি গদ্যরচনারও ইংরেজি ভাষান্তর প্রকাশ করলেন। হরিনাথ কৃত এই অনুবাদের নাম "The Coffin Maker"। সর্বোপরি এই সংখ্যায় তাঁর লেখা এক চমকপ্রদ রসরচনা ("An Appeal in a High Court against the Judgment of Dante") প্রকাশিত হয়। একটি হিব্রু আখ্যানের পটভূমিকায় তিনি সমসাময়িক কোনো ব্যক্তিচরিত্রকে অসাধারণ এক ব্যঙ্গাত্মক পরিপ্রেক্ষিতে উপস্থাপিত করেন।

'হেরাল্ড' পত্রিকার চতুর্থ সংখ্যায় (এপ্রিল 1911) হরিনাথের পাঁচটি রচনা প্রকাশিত হয়। গিরিশচন্দ্র ঘোষের একটি প্রসিদ্ধ গানের ("সাগর-কূলে বসিয়া বিরলে

হেরিব লহর-মালা") তিনি ছন্দোবদ্ধ ইংরেজী অনুবাদ প্রকাশ করেন। আর ইতালীয় ভাষা থেকে তিনি টীকাসহ জাকোমো লেওপার্দি (Giacomo Leopardi)-র বিখ্যাত কবিতা "এশিয়ার এক ভ্রমণরত মেষচারকের গান" ইংরেজীতে ছন্দোবদ্ধ অনুবাদ করলেন। হরিনাথ কৃত এই অনুবাদকর্ম "The Song of the Nigh'" এদেশে ইওরোপীয় কবিতার অনুবাদের ইতিহাসে এক স্মরণীয় ঘটনা। বাংলা ভাষা থেকে তিনি প্রিয়ংবদা দেবীর "স্মৃতিলোপ" কবিতাটি এবং একটি সুপরিচিত গানের ("ভালবাসা দুটি কথা প্রাণ তোমারে বলে রাখি") ইংরেজীতে ছন্দোবদ্ধ অনুবাদ প্রকাশ করেন। আর এই সংখ্যাতে তিনি ভূমিকাসহ অমৃতলাল বসুর বিখ্যাত 'বাবু' নাটকের ইংরেজী অনুবাদও প্রস্তুত করলেন। এই অনুবাদকর্ম তিনি উৎসর্গ করেন তাঁর পরম বন্ধু সতীশচন্দ্র ঘোষকে।

এই সময় হরিনাথ পারসীক ভাষায় লেখা শাহ্ আলমের জীবনী *(Shah Alam Nama)* সম্পাদনায় ব্যাপৃত ছিলেন। তাঁর মৃত্যুর পর 1912 খ্রীস্টাব্দে কলকাতার এশিয়াটিক সোসাইটি থেকে এই পারসীক রচনা প্রকাশিত হয়। এই সোসাইটির বার্ষিক অধিবেশনে (1913) আশুতোষ মুখোপাধ্যায় উক্ত মূল্যবান্ পারসীক গ্রন্থ সম্পাদনায় হরিনাথের পাণ্ডিত্যের উচ্চ প্রশংসা করেন।

হরিনাথের এরূপ অসংখ্য রচনা ছাড়া তাঁর অপ্রকাশিত লেখার পরিমাণও কম নয়। পূর্বেই বলা হয়েছে যে 1907 খ্রীস্টাব্দের 27 এপ্রিল তিনি কলকাতা হিস্টরিক্যাল সোসাইটির কাউন্সিলের সদস্য নির্বাচিত হন। এই সময় থেকেই তিনি ফরাসী ভাষায় লেখা জাঁ ল (Jean Law)-র স্মৃতিকথা *(Mémoire de M. Jean Law)* সম্পাদনার কাজে মনোযোগ দেন। এই মূল্যবান্ ঐতিহাসিক বৃত্তান্তের লেখক ছিলেন বাংলার নবাব সিরাজউদ্দৌলার ঘনিষ্ঠ বন্ধু এবং পলাশির যুদ্ধে ফরাসী সেনাবাহিনীর অধিনায়ক। পলাশির যুদ্ধের পূর্বেও তিনি ইংরেজদের বিরুদ্ধে এদেশী রাজন্যবর্গের সঙ্গে সমানে সহযোগিতা করেন। তাঁর সাহসিকতা স্বভাবতই তাঁকে এদেশে জনপ্রিয় ও মর্যাদার অধিকারী করেছিল। তাছাড়া তিনি ছিলেন সুলেখক। সমকালীন মানুষ ও ঘটনার বহু অজানা বৃত্তান্ত তাঁর এই ঐতিহাসিক স্মৃতিকথায় পাওয়া যায়। আর হরিনাথের এমন গুরুত্বপূর্ণ কাজে অপরিসীম আগ্রহ, ইতিহাস সম্পর্কে তাঁর জ্ঞানেরই সাক্ষ্য। এই সম্পাদনার সূত্রে তিনি যদুনাথ সরকার ও ফজল রবীকে চিঠি লেখেন। দীর্ঘকালের পরিশ্রমে ও নিষ্ঠায় তিনি এই মূল্যবান স্মৃতিকথার সম্পাদনা ফরাসী ভাষাতেই সম্পন্ন করেন। পুস্তকের প্রস্তাবনা, ভূমিকা ও মূলপাঠ (পৃষ্ঠা সংখ্যা তিনশ ছয়) তাঁর জীবৎকালেই মুদ্রিত হয়েছিল। ঐতিহাসিক চরিত্র, স্থান ও পারসীক শব্দের ব্যাখ্যাসহ বিস্তৃত তালিকারচনার কাজও তিনি সমাপ্ত করে গেছেন। দুর্ভাগ্যক্রমে তাঁর আকস্মিক মৃত্যুতে এই বহুমূল্য স্মৃতিকথা আজও অপ্রকাশিত রয়েছে।

পূর্বেই বলা হয়েছে যে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্তৃপক্ষের অনুরোধে হরিনাথ একখানি আরবী ব্যাকরণ প্রণয়ন করেন (1910)। এই বছরেই তিনি উক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের ম্যাট্রিকুলেশন্ পরীক্ষার সংস্কৃত পাঠ্যাংশের শব্দাবলী সংকলন করলেন। সর্বোপরি ইতিমধ্যে তিনি এক প্রকাণ্ড ইংরেজী-পারসীক শব্দকোষ সংকলনের কাজও প্রায় সম্পন্ন করেন। এছাড়া তিব্বতীয়, চীনা, পারসীক, সংস্কৃত, পালি, প্রাকৃত প্রভৃতি ভাষা ও সাহিত্য বিষয়ে হরিনাথের অপ্রকাশিত রচনা আজও বর্তমান।

হরিনাথ আরবী ভাষায় লেখা মুসলমান রাজবংশের ইতিহাস গ্রন্থের *(Al-Fakhrî)* প্রথম ভাগের ইংরেজী অনুবাদও সম্পন্ন করেন রাষ্ট্রকলা, সরকার এবং রাজবংশাবলী সম্পর্কিত এই প্রসিদ্ধ গ্রন্থের লেখক হলেন জলালুদ্দিন আবু জফর মুহম্মদ (Jalal-ud-din Abu Jafar Muhammad)। ইবন্ আত-তিক্তকা (Ibn ut-Tiqtaqa) নামেই তিনি অধিক পরিচিত। 1302 খ্রীস্টাব্দের ফেব্রুয়ারি থেকে জুন মাসের মধ্যে লেখা তাঁর এই ইতিহাস আজও মূল্যবান্। প্রসঙ্গত উলেখ্য যে হরিনাথের মৃত্যুর ছত্রিশ বছর পরে উক্ত গ্রন্থের ইংরেজী অনুবাদ প্রকাশ করেন সি. ই জে হুইটিং (C E. J. Whitting)। আরবী ভাষায় লেখা অনেকগুলি তাম্রলিপির পাঠোদ্ধারও হরিনাথ করেছিলেন।

ইংরেজী অনুবাদসহ হরিনাথ সুবিখ্যাত সংস্কৃত মহাকাব্য 'নৈষধ-চরিত'-এর এক বিস্তৃত সংস্করণ প্রকাশনায় ব্যাপৃত হন। বলা বাহুল্য, সঠিক ব্যাখ্যা ছাড়া শ্রীহর্ষের এই শ্রেষ্ঠ কীর্তির রসগ্রহণ অনেক সময় অভিজ্ঞ পাঠকের পক্ষেও কষ্টসাধ্য। বাল্মীকির 'রামায়ণ' এবং বিশাখদত্তের 'মুদ্রারাক্ষস' নাটকের অনুবাদও হরিনাথ শুরু করেন। 'ঋগ্‌বেদ' থেকে তাঁর অনূদিত সুক্তগুলি এতকাল অপ্রকাশিতই ছিল। 1972 খ্রীস্টাব্দে বর্তমান জীবনীকারের সম্পাদিত *Harinath De – Select Papers : Mainly Indological* গ্রন্থে তাঁর অন্যান্য রচনাবলীর সঙ্গে এই অনুবাদও প্রকাশিত হয়েছে। এছাড়া তিনি গিরিশচন্দ্র ঘোষের 'সিরাজউদ্দৌলা' এবং অমৃতলাল বসুর 'রাজা বাহাদুর' নাটক দুটির অনুবাদেও অগ্রসর হন। তাঁর নির্বাচিত বেশ কিছু সংখ্যক গ্রীক কবিতার স্বকৃত ছন্দোবদ্ধ ইংরেজী অনুবাদ আজও অপ্রকাশিত রয়েছে।

এইভাবে সাহিত্য ও বিদ্যাচর্চা যখন ক্রমান্বয়ে পরিণতি অর্জন করে চলেছে, হরিনাথের জীবনের ঠিক সেই উজ্জ্বলতম অধ্যায়ে এল তাঁর আকস্মিক মৃত্যু। চৌত্রিশ বছর বয়সে এই চূড়ান্ত যবনিকাপাতের পূর্বের মুহূর্ত পর্যন্ত তাঁর সাধনা সমানে অব্যাহত ছিল।

ইন্দ্রপতন

1911 খ্রীস্টাব্দের 15 আগস্ট হরিনাথ আকস্মিকভাবে টাইফয়েড রোগে আক্রান্ত হন। তিন চার দিন রোগভোগের পর তিনি প্রায় অচৈতন্য হয়ে পড়েন। কলকাতার মেডিক্যাল কলেজের অধ্যক্ষ জে. টি. ক্যাল্‌ভার্ট (J. T. Calvert), নীলরতন সরকার, প্রাণধন বসু, হরিনাথ ঘোষ প্রমুখ বিশিষ্ট চিকিৎসকেরা তাঁকে বাঁচাতে যথাসাধ্য চেষ্টা করেন। কিন্তু তাঁদের সব চেষ্টাই শেষ পর্যন্ত ব্যর্থ হল। পনের দিন রোগভোগের পর 30 আগস্ট সকাল সাড়ে দশটায় হরিনাথ মারা গেলেন। ভাষা ও বিদ্যাচর্চার ক্ষেত্রে ঘটল এক ইন্দ্রপতন। এই উদার মানুষটির কাছ থেকে এতকাল অসংখ্য বিদ্যানুরাগী পেয়েছিলেন প্রেরণা ও সহযোগিতা। তাই তাঁর এই অকালমৃত্যু স্বভাবত তাঁদের খুব বিচলিত করল।

হরিনাথের মৃত্যুর পরবর্তী ছবিটি নিঃসন্দেহে সাহিত্যের বিষয় হিসাবে স্থান পাওয়ার যোগ্য। এই মানবতাবাদের সার্থক প্রতিনিধি হলেন রামমোহন রায়, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, মধুসূদন দত্ত, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, মোহনদাস করমচাঁদ গান্ধী প্রমুখ মনীষী। দেশকালের সীমা ছাপিয়ে তাঁদের ব্যক্তিত্বের মানবতাবাদী অভিব্যক্তি সমগ্র বিশ্বের ওপর পড়েছে। হরিনাথও আমাদের দেশের অন্যতম শ্রেষ্ঠ মানবতাবাদী। এক গভীর মানবতাবোধ থেকেই তিনি ভাষাচর্চার প্রেরণা পেয়েছিলেন। তাই তাঁর বিদ্যাচর্চা ও দৈনন্দিন জীবনধারায় এই মানবতাবোধের প্রভাব স্বভাবতই সুস্পষ্ট।

মৃত্যুর কিছু পরে হরিনাথের নশ্বর দেহটিকে ঘর থেকে বাইরে আনা হল। ইতিমধ্যে বহু মানুষের সমাগম ঘটেছিল তাঁর বাড়িতে। বৌদ্ধশাস্ত্রে সুপণ্ডিত ইয়ামাকামি সোগেন জাপানী ভাষায় নিঃশব্দে মন্ত্র উচ্চারণ করতে করতে অনুগমন করে চললেন। একজন ছাত্র এগিয়ে এসে তাদের প্রিয় অধ্যাপকের বুকের ওপরে একটা বই তুলে দিয়ে তাঁর উদ্দেশে শ্রদ্ধাঞ্জলি জানাল। বেলা দুটোর সময় 30 নং বাহির মির্জাপুর রোড থেকে হরিনাথের মৃতদেহকে নিয়ে শবযাত্রা বেরুল নিমতলা ঘাটের দিকে। বহু ছাত্র, বন্ধু, আত্মীয় ও গুণমুগ্ধ মানুষ এই বেদনাতুর শবযাত্রায় যোগ দেন। অনেকের নীরবতা, অনেকের সজল চোখ গভীর বেদনায় ভরিয়ে তুলল শ্মশানযাত্রা। শেষ ঠিকানা নিমতলা শ্মশান। একটা যুগ, এক বিরাট ইতিহাস যেন হঠাৎ এসে থমকে দাঁড়াল। কলকাতার পণ্ডিত-সমাজ যাঁরা এক সময় এই প্রতিভাবান্ মানুষটিকে নিয়ে গর্ব করতেন তাঁদের অনেকেই সমবেত হলেন নিমতলায়। ধীরে ধীরে হরিনাথের দেহটিকে চিতায় তোলা হল।

এই সময় তাঁর অন্তরঙ্গ বন্ধু আব্‌দুল্লাহ্‌ অল্‌-মামুন্‌ সুহরাবর্দিকে সান্ত্বনা দেওয়া প্রায় অসম্ভব হয়ে পড়ে। তিনি তাঁর বন্ধুর চিতায় ঝাঁপ দিতে উদ্যত হন। তারপর কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই এই ক্ষণজন্মা পুরুষের সঙ্গে পৃথিবীর সব যোগাযোগ নিশ্চিহ্ন হয়ে গেল। শুধু প্রশ্ন থেকে গেল,—কে আবার প্রাচ্যের সাহিত্য-সংস্কৃতিকে আন্তর্জাতিক মানে প্রতিষ্ঠিত করার গুরুদায়িত্ব গ্রহণ করবেন ?—কে আবার চৌত্রিশ বছর বয়সে ভাষা-সমুদ্র মন্থন করবেন ? কবি সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত লিখেছেন :

"আজ শ্মশানে বহ্নিশিখা অভ্রভেদী তীব্র জ্বালা, / আজ শ্মশানে পড়ছে ক'রে উল্কাতরল জ্বালার মালা ! / যাচ্ছে পুড়ে দেশের গর্ব,—শ্মশান শুধু হচ্ছে আলা, / যাচ্ছে পুড়ে নূতন ক'রে সেকেন্দ্রিয়ার গ্রন্থশালা।

একটি চিতায় পুড়ছে আজি আচার্য আর পুড়ছে লামা, / প্রোফেসার আর পুড়ছে ফুঙি, পুড়ছে শমস্-উল্-উলামা। / পুড়ছে ভট্ট সঙ্গে তারি মৌলবী সে যাচ্ছে পুড়ে / ত্রিশটি ভাষার বাসাটি হায় ভস্ম হ'য়ে যাচ্ছে উড়ে।

একত্রে আজ পুড়ছে যেন কোকিল, 'কু-কু', বুলবুলেতে, / দাবানলের একটি আঁচে নীড়ের পিঠে পক্ষ পেতে, / পড়ছে ভেঙে চোখের উপর বর্তমানের বাবিল-চূড়া, / দানেশ-মন্দী তাজ সে দেশের অকালে আজ হচ্ছে গুঁড়া।

আজ শ্মশানে বঙ্গভূমির নিবল উজল একটি তারা, / রইল শুধু নামের স্মৃতি রইল কেবল অশ্রুধারা ; নিবে গেল অমূল্য প্রাণ, নিবে গেল বহ্নিশিখা, / বঙ্গভূমির ললাট পরে রইল আঁকা ভস্মটীকা।"

এই হৃদয়বান্‌ পণ্ডিতের অকালমৃত্যুতে অসংখ্য দরিদ্র ছাত্র হারাল তাদের একমাত্র সম্বল, অভাবীরা হল সহায়হীন। একথা ঠিক যে ইতিহাস কাউকে ক্ষমা করে না, সে চলে তার নিজের গতিতে। ইতিহাস সাক্ষী হয়ে থাকে মহত্ত্বের, আবার ইতিহাসই ভাবী মানুষের কাছে বহু অজানা বিদ্বেষের সাক্ষ্য দেয়। তাঁর জীবৎকালে ইম্পিরিয়াল লাইব্রেরির চাকরিতে তাঁকে অপমানিত করার চেষ্টাতেও এইসব খ্যাতিমান্‌ ভারত সন্তানেরা মত্ত হয়েছিলেন। অবশ্য এই কৃতী পুরুষের আকস্মিক মৃত্যুতে বিভিন্ন শিক্ষাকেন্দ্র ও সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠান স্বভাবতই শোকপ্রকাশ করেন। তাঁর মৃত্যুর পরের দিন (31 আগস্ট 1911) কলকাতার স্কটিশ চার্চ স্কুল ও কলেজ কর্তৃপক্ষ ছাত্রদের অর্ধদিবস ছুটি অনুমোদন করলেন। 1911 খ্রীস্টাব্দের 1 সেপ্টেম্বর কলকাতার সেন্ট্‌ জেভিয়ার্স কলেজে হরিনাথের মৃত্যুতে এক শোকসভা অনুষ্ঠিত হয়। এই সভায় কলেজের অধ্যক্ষ ই. ওনীল্‌ (E. O'Neill) সভাপতিত্ব করেন। উক্ত কলেজের অনেক গুণী অধ্যাপক এবং প্রায় সমস্ত ছাত্রই এই প্রতিভাবান্‌ ও হৃদয়বান্‌ মানুষটির প্রতি শ্রদ্ধা জানাতে উপস্থিত হন শোকসভায়। আর এই সূত্রে বেলা সাড়ে বারোটায় সময় সেদিনের জন্য এই কলেজের ছুটি ঘোষিত হয়। 1911 খ্রীস্টাব্দের 6 সেপ্টেম্বর কলকাতার এশিয়াটিক সোসাইটির সাধারণ অধিবেশনে ডঃ আব্‌দুল্লাহ্‌ অল্‌-মামুন সুহরাবর্দি তাঁর অন্তরঙ্গ বন্ধু হরিনাথের মৃত্যুতে একটি শোকবার্তা পাঠ করেন। সভাপতির আসনে উপবিষ্ট ছিলেন ডি. সি ফিলোট্‌ (D. C. Phillott)। এই

শোকসভায় সেকালের স্বনামধন্য দেশবিদেশী পণ্ডিতেরা উপস্থিত ছিলেন। আব্‌দুল্লাহের শোকবার্তাটি পরে (8 সেপ্টেম্বর 1911) কলকাতার দুটি দৈনিক সংবাদপত্রে প্রকাশিত হয়। তাঁর এই রচনায় একটি তাৎপর্যপূর্ণ কাহিনী আমরা পাই। আর এই করুণ কাহিনীর মধ্যে হরিনাথের নিজস্ব একটি মন্তব্য আছে। হরিনাথের এই মন্তব্যে যে বিষাদ, যে মৃত্যুর পূর্বাভাষ ফুটে উঠেছে তার অব্যর্থ পরিচয় আমরা পাই 1911 খ্রীস্টাব্দের 30 আগস্ট। ডঃ সুহ্‌রাবর্দির লেখা থেকে জানা যায় যে 1909 খ্রীস্টাব্দের সেপ্টেম্বর মাসে তিনজন বন্ধু একটি টেবিলে বসে শিল্প ও সাহিত্য নিয়ে আলোচনা করছিলেন। এই তিনজন হলেন হরিনাথ, আব্‌দুল্লাহ্ এবং এর্‌নস্ট্ টেওডোর ব্লখ্। তাঁরা সকলেই ছিলেন বয়সে তরুণ এবং সকলেই কলকাতার এশিয়াটিক সোসাইটির সদস্য। এশিয়াটিক সোসাইটির বিদ্যাচর্চার পরিবেশ তাঁদের তিনজনের মনে এক অপরিসীম আগ্রহ সৃষ্টি করেছিল। তাঁরা তখন স্বপ্ন দেখছিলেন যে ভবিষ্যতে তাঁরা এমন একটি গুরুত্বপূর্ণ কাজ করবেন যার দ্বারা তিন বন্ধুই স্মরণীয় হয়ে থাকবেন। এই আলোচনার সূত্রে তাঁরা ভাবছিলেন যে পৃথিবীর ইতিহাসে একজন হিন্দু, একজন মুসলমান এবং একজন খ্রীস্টানের সমবেত চেষ্টায় এক সময় তৈরি হয়েছিল এক সংস্কৃতি ও চিন্তার জগৎ। তাঁরা উপলব্ধি করছিলেন যে আবার একজন হিন্দু, একজন মুসলমান এবং একজন খ্রীস্টানের সমবেত চেষ্টায় উপনিষদের এক নূতন সংস্করণ প্রকাশিত হবে। এই সময় হরিনাথের মধ্যে এক চিন্তাবেশ ঘটল। তিনি ভাবতে শুরু করলেন অনুরূপ কাজে তাঁদের পূর্বসূরিদের জীবনের করুণ পরিণামের কথা। হরিনাথ বিমর্ষভাবে আরও বলেছিলেন, 'আমরা আমাদের পূর্বসূরিদের পরম দুর্ভাগ্য এড়াতে পারব কি পারব না একথা কে জানে? আমার মনে হয় সেই সময় আসন্ন যখন আমাদের এই তিনজনের একজনের জন্য আমাদের বিলাপ করতে হবে।' 1909 খ্রীস্টাব্দের 20 অক্টোবর ব্লখ্ সাহেব হঠাৎ মারা যান। আর ভারতের ইতিহাসচর্চা অপূরণীয়ভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হল। হরিনাথ তখন তাঁর ভবিষ্যৎ বাণীর কথা আব্‌দুল্লাহ্‌কে স্মরণ করিয়ে দিয়েছিলেন। কিন্তু তাঁর এই ভবিষ্যৎ বাণীতে আসলে ব্লখের মৃত্যু নির্দেশিত হয়নি। তাঁর কথাগুলির অব্যর্থ সত্যতা সুস্পষ্ট হল 1911 খ্রীস্টাব্দের 30 আগস্ট। ডঃ সুহ্‌রাবর্দি লিখেছেন: "মনে হয় যেন মাত্র গতকাল হরিনাথ দে তাঁর মৃত সহকর্মী ব্লখের শোকবার্তাটি পাঠ করলেন। এবং সহসা মৃদুস্বরে আমাকে বললেন, 'ফিলোট্ অথবা তোমাকে শীঘ্রই এমন আর একটি দায় পালন করতে হবে'। আজকের রাত হল তাঁর ভবিষ্যৎবাণীর বিষাদময় সত্যতার রাত।"

শোকসভার আর শেষ হয় না হরিনাথের অকালমৃত্যুতে শোকপ্রকাশের জন্য 1911 খ্রীস্টাব্দের 8 সেপ্টেম্বর কলকাতার বৌদ্ধধর্মাঙ্কুর সভার এক বিশেষ অধিবেশন অনুষ্ঠিত হয়। এই শোকসভায় সভাপতির আসন গ্রহণ করেন কৃপাশরণ মহাস্থবির।

উক্ত সভার সম্পাদক বেণীমাধব বড়ুয়া অতি সুলিখিত ভাষায় হরিনাথের গুণাবলী সম্পর্কে এক চমৎকার বক্তৃতা দেন। 1911 খ্রীস্টাব্দের 9 সেপ্টেম্বর কলকাতার রিচার্ডসন্ সোসাইটি এক শোকসভার আয়োজন করেন। এই সভায় বক্তাদের মধ্যে অন্যতম ছিলেন বিখ্যাত অধ্যাপক হেন্‌রি স্টীফেন্ (Henry Stephen)। কলকাতার এইচ. এম্. ডিবেটিং ইউনিয়নও অনুরূপ শোকসভার আয়োজন করেন (10 সেপ্টেম্বর 1911)। এই সভায় কালিদাস বসু দুঃখের সঙ্গে মন্তব্য করেছিলেন যে এ যুগের অন্যতম শ্রেষ্ঠ ভাষাবিদের অকালমৃত্যুতে কোনো "প্রতিনিধিত্বমূলক সভা" অনুষ্ঠিত হল না।

1912 খ্রীস্টাব্দের 7 ফেব্রুয়ারি কলকাতার এশিয়াটিক সোসাইটির বার্ষিক অধিবেশনে সভাপতি জি. এফ্. এ. হ্যারিস্ স্বভাবতই হরিনাথের স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধা জানান। হরিনাথের জীবন ও কর্মের বিবরণ পেশ করার পর তিনি মন্তব্য করেছিলেন : "তাঁর মৃত্যুতে শুধুমাত্র ভারতবর্ষ নয়, ক্ষতিগ্রস্ত হল সমগ্র পৃথিবী। আর নিজেদের দিক্ থেকে আমরা হারালাম এমন এক অসাধারণ পণ্ডিতকে যাঁর ভাষাতত্ত্বের চর্চায় ছিল অসামান্য অধিকার। তিনি দীর্ঘজীবী হলে তাঁর সহকর্মীরা হতে পারতেন জ্ঞানে ও ও কর্মে আরও পারঙ্গম।" হ্যারিস্ সাহেবের এই মন্তব্যটি যে কোনো ভারতীয়ের পক্ষেই গর্বের।

আয়ুরেখা দীর্ঘ ছিল না হরিনাথের। চৌত্রিশ বছরের সংক্ষিপ্ত জীবনের স্বল্প পরিসরে তিনি বিদ্যাচর্চার বহু বিচিত্র শাখায় নিজেকে নিয়োজিত করেছিলেন। ভাষাচর্চায়, শিক্ষাদানে, অনুবাদকর্মে, পুস্তক সম্পাদনায় এবং সর্বোপরি বিদ্যানুরাগীদের সযত্ন সহায়তায় তিনি নিজেই হয়ে উঠেছিলেন এক প্রতিষ্ঠান। তাই তাঁর আকস্মিক মৃত্যুতে যে শোকের পরিব্যাপ্তি তা কোনো বিশেষ ব্যক্তির বিয়োগজনিত বেদনাবোধ নয়। এক বৃহৎ সংস্থার সমাপ্তি যাকে আশ্রয় করে গড়ে উঠেছিল সমকালীন জ্ঞানচর্চার সুবৃহৎ অঙ্গন।

ইতিহাস মানুষ সৃষ্টি করে না, মানুষই সৃষ্টি করে ইতিহাস। স্বল্পকালের চর্চায় হরিনাথ এদেশে ভাষাচর্চার একক ঐতিহ্য গড়ে তোলেন। অনুবাদকর্মের নিপুণতায় তিনি এনেছিলেন বিস্ময়কর নিষ্ঠা ও সাফল্য। অধ্যাপনার ক্ষেত্রে তিনি ছাত্রদের কাছে সমগ্র পৃথিবীর জ্ঞান ভাণ্ডার উন্মোচিত করেছিলেন। আর বিদ্যানুরাগীদের সহায়তার বিষয়ে তাঁর মহানুভবতার কোনো তুলনা মেলে না। এই বৈচিত্র্য ও বহুধা গুণের সমন্বয় শুধুমাত্র একালে বা এদেশেই বিরল নয়, সর্বকালের এবং সর্বদেশের পক্ষেই সমানভাবে প্রযোজ্য।

গ্রন্থপঞ্জী

অঘোরনাথ ঘোষ। "আচার্য হরিনাথ", 'প্রতিভা' (ঢাকা), আশ্বিন 1319 বঙ্গাব্দ।
অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর ও রাণী চন্দ। 'জোড়াসাঁকোর ধারে', পুনর্মুদ্রণ, কলিকাতা, 1362 বঙ্গাব্দ।
কুমুদবন্ধু সেন। 'গিরিশচন্দ্র [ঘোষ] ও নাট্যসাহিত্য', কলিকাতা 1342 বঙ্গাব্দ।
জ্ঞানেন্দ্রমোহন দাস। 'বঙ্গের বাহিরে বাঙ্গালী', তৃতীয় ভাগ, কলিকাতা, 1931।
দীনেশচন্দ্র সেন। 'আশুতোষ [মুখোপাধ্যায়]-স্মৃতিকথা', কলিকাতা 1936।
ধর্মানন্দ কোসম্বী। 'নিবেদন' (মারাঠী ভাষায় লেখা), বোম্বাই, 1924।
'নব্যভারত' (কলিকাতা), কার্তিক 1318 বঙ্গাব্দ।
নির্মলচন্দ্র চক্রবর্তী। "কবি রঙ্গলাল [বন্দ্যোপাধ্যায়]", 'ভারতবর্ষ' (কলিকাতা), পৌষ 1324 বঙ্গাব্দ।
পঙ্কজিনী বসু। 'স্মৃতিকণা', চট্টগ্রাম, 1916।
ফকিরচন্দ্র দত্ত। "উন্মাদ ও প্রতিভা", 'ভারতবর্ষ', শ্রাবণ 1322 বঙ্গাব্দ।
বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ, কলিকাতা। সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা ও বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের অষ্টাদশ এবং বিংশ সাংবৎসরিক কার্যবিবরণী, 1319 ও 1321 বঙ্গাব্দ।
বিজয়চন্দ মহ্‌তাব। "আমার য়ুরোপ ভ্রমণ", 'ভারতবর্ষ', ফাল্গুন 1320 বঙ্গাব্দ।
বিজয়চন্দ্র নাগ। 'নাগবংশের ইতিবৃত্ত ও সেরপুর টাউনের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস', ময়মনসিং, 1336 বঙ্গাব্দ।
বৌদ্ধধর্মাঙ্কুর সভা, কলিকাতা। বৌদ্ধধর্মাঙ্কুর সভার ঊনবিংশ বার্ষিক কার্যবিবরণী, 1910-1911।
'ভারতবর্ষ' (কলিকাতা), ফাল্গুন 1320 বঙ্গাব্দ।
'ভারতী' (কলিকাতা), আশ্বিন 1318 বঙ্গাব্দ।
রজনীকান্ত গুহ। 'আত্মচরিত', কলিকাতা, 1949।
রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়। 'বাঙ্গলার ইতিহাস' প্রথম ভাগ, দ্বিতীয় সংস্করণ, কলিকাতা, 1330 বঙ্গাব্দ।
রাজেন্দ্রনাথ বিদ্যাভূষণ। 'কালিদাস', কলিকাতা, 1315 বঙ্গাব্দ।
সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত। 'কুহু ও কেকা', মিত্র ও ঘোষ সংস্করণ, কলিকাতা, 1368 বঙ্গাব্দ।
'সমাজ' (কলিকাতা), আশ্বিন 1318 বঙ্গাব্দ।

'সাহিত্য-সংবাদ' (কলিকাতা), ভাদ্র 1318 বঙ্গাব্দ।

সুনীল বন্দ্যোপাধ্যায়।

'ভাষাপথিক হরিনাথ দে', কলিকাতা, 1379 বঙ্গাব্দ।

"হরিনাথ দে : ঔপাখ্যানিক নায়ক ও তাঁর শরীরী অস্তিত্ব", 'পশ্চিমবঙ্গ' (কলিকাতা), 25 আগস্ট 1972।

"হরিনাথ দে", 'ভারতকোষ', পঞ্চম খণ্ড, কলিকাতা, 1973।

"হরিনাথ দে ও কলকাতার ইম্পিরিয়্যাল লাইব্রারি", 'গ্রন্থাগার' (কলিকাতা), অগ্রহায়ণ 1382 বঙ্গাব্দ।

"রবি দত্ত : বিস্মৃত কবি-অনুবাদক", 'সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা' (কলিকাতা), সংখ্যা 3, 1374 বঙ্গাব্দ।

"কবিতা. নিঃসঙ্গপ্রবাস ও মনোমোহন ঘোষ", কলিকাতা, 1381 বঙ্গাব্দ।

"হরিনাথ দে : জীবন ও প্রজ্ঞার জ্যোতির্ময় জনশ্রুতি", 'দেশ' (কলিকাতা). 28 শ্রাবণ 1384 বঙ্গাব্দ।

"হরিনাথ দে : শতবর্ষের আলোকে", 'হরিনাথ দে জন্মশতবর্ষ স্মারক গ্রন্থ', কলিকাতা, 1977।

"বহুভাষিতা, ভাষাতত্ত্বের চর্চা এবং হরিনাথ দে", 'পরিচয়' (কলিকাতা), অগ্রহায়ণ 1384 বঙ্গাব্দ।

Amrita Bazar Patrika, Calcutta. Thursday, August 31, 1911 ; Friday, September 8, 1911.

Asiatic Society, Calcutta. *Journal and Proceedings*, 1905-1913. *Proceedings*, January-December 1903.

Bandyopadhyay, Sunil.

"A Bengali Polyglot of Rare Distinction", *The Statesman* (Calcutta), Monday, September 7, 1964.

"Harinath De", *Amrita Bazar Patrika*, Monday, November 20, 1967.

"Biography of Harinath De", *The Hindusthan Standard* (Calcutta), Monday, November 20, 1967.

"Ibn Batutah's Account of Bengal", tr. from the Arabic by Harinath De, *Journal of Ancient Indian History* (Calcutta), Vol. V, Parts 1-2, 1971-72.

Harinath De—Select Papers : Mainly Indological, Calcutta, 1972

Bandyopadhyay, Sunil.

"Harinath De : A Centennial Homage", *Harinath De Centenary Volume*, Calcutta, 1977.

"Harinath De : Frustrated Genius and Shattered Dreams," *Harinath De Birth Centenary Souvenir*, Calcutta, 1977.

Harinath De : A Profile of the Man and his Work, Calcutta University, 1979.

Batakrishna Ghosh—A Survey of Indo-European Languages, Calcutta. 1979.

Banerjee, Nripendra Chandra. *At the Crossroads*, Second edition, Calcutta, 1974.

Banerji, Satis Kumar. *An up-to-date Bengali to Bengali and English Dictionary*, third edition, Calcutta, 1914.

The Educational Guide, Calcutta, 1908.

(The) Bengal Directory, Calcutta, 1878-1886.

Bengal Library. Calcutta. *Catalogue of Books*, 1902-1912.

Bengal Past and Present, Calcutta. Vols. I, 1907 ; III, 1909 ; IV, 1910 ; VIII, 1914 ; XV, 1915.

(The) Bengalee, Calcutta. Thursday, August 31, 1911 ; Saturday, September 2, 1911 ; Saturday, January 18, 1913.

(The) Calcutta Gazette. Wednesday, February 20, 27, 1907 ; May 15, 1907 ; July 27, 1907 ; January 29, 1908 ; February 10, 1911 ; March 15, 1911 ; October 18, 1911.

Calcutta University.

Calendar 1858-59, 1868-1875, 1877-1878, 1893, 1895, 1897, 1899, 1901-1911.

Minutes, 1858, 1892-1911.

(The) Calcutta University Magazine. June 1894 ; February 1897 ; March 1897 ; June 1899 ; March-April 1908 ; November-December 1911.

Cambridge University.

The Book of Matriculations and Degrees, Cambridge, 1902.

Calendar 1901-1902.

The Historical Register of the University of Cambridge, Cambridge, 1917.

Chapman, J. A. *The Character of India*, Oxford, 1928.

Chatterji, S. K. "Linguistics in India", *Progress of Indic Studies*, 1917-1942, ed. by R. N. Dandeker, Poona, 1942.

Christ's College Magazine, Cambridge. Michaelmas Term, Vols. XII, No. 35, 1897 ; XIII, No. 38, 1898 ; XV, No. 44, 1900 ; XVI, No. 47, 1901.

Dutt, Surendra Nath. *The Life of Benoyendra Nath Sen*, Calcutta, 1928.

(The) Englishman, Calcutta. Thursday, August 31, 1911 ; Friday, September 1, 1911 ; Thursday, September 7, 1911.

(The) Gazette of India, Delhi and Simla. Part I, Saturday, July 27, 1907 ; January 25, 1908 ; March 11, 1911 ; October 14, 1911.

Ghose, A[ghorenath]. "The late Mr. Harinath De", *The Calcutta University Magazine*, November-December 1911.

Government of Bengal.

History of Services of Gazetted and other Officers Serving under the Government of Bengal, Part II, 1902-1907.

Proceedings of the General Department, Education Branch, 1907-1908 (Unpublished).

Government of Central Provinces.

The Quarterly Civil List for the Central Provinces, 1888-1890.

Government of India (General Branch).

"Confidential Notes", Part I, Education Department, 1911 (Unpublished).

History of Services of Officers holding Gazetted appointments in the Home, Education, Foreign, Revenue and Agricultural, Legislative and Commerce and Industry Departments, 1907-1911.

Proceedings of the Education Department, Nos. 4-17, January 1912 (Unpublished).

Guha Chaudhuri, Dwijendranath. "Harinath De : a Savant," *Barishal Hitaishi*, Wednesday, August 1, 1945.

(The) Herald, Calcutta. January-April 1911.

Hooghly College Register, 1836-1936, Calcutta, 1936.

Imperial Library, Calcutta :

Annual Reports, 1906-1910.

Reports on the working of the Imperial Library, 1911-1912.

(The) Indian Daily News, Calcutta. Thursday, August 31, 1911 ; Friday, September 1, 1911 ; Monday, September 4, 1911 ; Tuesday, September 5, 1911 ; Thursday, September 7, 1911 ; Friday, September 8, 1911 ; Wednesday, September 13, 1911.

(The) Indian Mirror, Calcutta. Saturday, November 11, 1905 ; Wednesday, November 29, 1905.

Journal of the Moslem Institute, Calcutta. J ly-September 1905 ; October-December 1905 ; January-March 1906.

Kesavan, B. S. *India's National Library*, Calcutta, 1961.

Kumar, S[urendranath]. *Khuddaka Patha*, Calcutta, 1909.

Law, Jean. *Mémoire sur quelques affairs de l'Empire Mogol, 1756-1761*, Publié par Alfred Martineau, Paris, 1913.

Mahtab, B. C. *Impressions. The Diary of a European Tour*, London, 1908.

(The) Modern Review, Calcutta. October 1911.

Mookerjee, Asutosh. *Addresses (Literary and Academic)*, Calcutta, 1915.

(The) Mussalman, Calcutta. Friday, September 1, 1911.

National Library, Calcutta. *Golden Jubilee Souvenir Volume*, 1953.

Nicholson, Reynold A. *Translations of Eastern Poetry and Prose*. Cambridge, 1922.

Peile, J[ohn]. *Biographical Register of Christ's College*, Cambridge, Part II, Cambridge, 1913.

(The) Pioneer, Allahabad. Friday, September 1, 1911.

Presidency College, Calcutta.

Centenary Volume, Calcutta, 1956.

Register, comp. and ed. by Surendrachandra Majumdar and Gokulnath Dhar, Calcutta, 1927.

R. D. "Harinath De," *The Indian Daily News*, Tuesday, September 5, 1911.

Ross, E. Denison. "The Persian and Turki Divâns of Bayram Khân, Khan Khânan," *Bibliotheca Indica*, New Series, No. 1090, Asiatic Society of Bengal (Calcutta), 1910.

Both Ends of the Candle, London, 1943.

Royal Asiatic Society of Great Britain and Ireland, London. *Journal*, 1902-1904.

Russel, C. W. *The Life of Cardinal Mezzofanti*, London, 1858.

Sastri, Haraprasad. "The Northern Buddhism," *The ndian Historical Quarterly* (Calcutta), June 1925.

Sengupta, Sureshchandra. *Old Memories in a New Age*, Calcutta, 1957.

Stapleton, H. E. "Looking Back over the Years," *The Presidency College Magazine* (Calcutta), June 1955.

(The) Statesman, Calcutta. Thursday, October 19, 1905 ; Saturday, June 1, 1912 ; Wednesday, August 31, 1977.

Thacker's Indian Directory, Calcutta, 1888-1890, 1902-1907.

(The) Times of India, Bombay ; Friday, September 1, 1911.

Winternitz, M. *A History of Indian Literature*, tr. from the original German by Miss S. Ketkar and Miss H. Kohn. Vol. II, Calcutta, 1933.

Yamakami, Sōgen. *Systems of Buddhistic Thought*, Calcutta, 1912.

Zeitschrift der Deutschen Morgenlaendischen Gesellschaft. Leipzig, 1906-1910.

जुपिटर आफसेट प्रैस, 10/3 बी, झिलमिल इंडस्ट्रियल एरिया, जी.टी. रोड, शाहदरा, दिल्ली-110032 द्वारा मुद्रित।